রবীন্দ্রনাথের কথা

"ন খলু স উপরতো যস্ত বল্লভো জনঃ স্মরতি।"

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় শব্দকোষ সংকলয়িতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের ভূতপূর্ব
প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক

সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী
১-১এ, কলেজ স্কোয়ার, ঈষ্ট,
কলিকাতা।

নিবেদন

কবির স্বর্গারোহণের পরে কবির গুণগরিমার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির প্রতিভা বহুমুখী, গুণকথাও নানাবিধ; তাই বোধ হয় প্রবন্ধ রচনার বিষয় এখনও নিঃশেষে পর্য্যবসিত হয় নাই। "রবীন্দ্রনাথেব কথায়" তাঁহার গুণকথাসমূহের কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কাল হইতে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য আমার হইযাছিল। এই সময়ে আমি সেই মহাপুরুষের উপদেশে, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে ও অনুষ্ঠানে যে সকল মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত প্রবন্ধসমূহের বিষয়; এই বিষয়গুলি অধিকাংশই আমার প্রত্যক্ষীভূত; কতকগুলি আমার বিশ্বস্তের নিকট হইতে সংগৃহীত হইলেও তাহা আমার প্রত্যক্ষের ন্যায়ই মনে করি। কবির চরিত্রে আমি বস্তুতঃ যাহা দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই প্রবন্ধ-গুলিতে অবিকল বর্ণিত হইয়াছে; ইহাতে পক্ষপাত জন্য অতিরঞ্জনের বা কল্পনার লেশমাত্র ছায়াপাত যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ সাবধান হইয়াছি। আশা করি পাঠক মহাশয়েরা পাঠান্তে আমার এই কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

বিনয়াবনত

শ্রীহরিচরণ শর্ম্মা

এই প্রবন্ধগুলির কয়েকটী প্রবন্ধ "প্রবাসী" "দেশ" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহাপুরুষের জীবনী আপনাকেই প্রকাশ করে তা নয়, জ্যোতিঃপরিক্রমার পথে চতুর্দিকের সংসারকেন্দ্র উদ্‌ভাসিত ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথের আত্মসৃষ্টিময় আলোকে শান্তিনিকেতন নিয়ত ভ'রে উঠত, তাঁর গানে কবিতায় ছেয়ে থাকত আশ্রমের শান্ত পরিমণ্ডল, জ্ঞান তপস্যার ফল তিনি সহযোগী কর্মী এমন কি অল্পবয়সের ছাত্র-ছাত্রী সকলেরই জীবনে পৌছিয়ে দিতেন। দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ সত্য হয়ে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলেছিল। কেন্দ্রে ছিলেন মহাকবি যিনি একাধারে বন্ধু, শিক্ষাগুরু, এবং নিত্য উৎসবের সহচর। আদিপর্বের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে বলা চলে। তখন যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সহজ সান্নিধ্য পেয়েছেন, বৃহত্তর আত্মীয় সমাজ গ'ডে ওঠবার পূর্বে আশ্রমেব ছিল সেই নিভৃত আরুণিক যুগ। শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বাবুর স্মৃতিকথায় সেই যুগের ছবি বর্ণিত হয়েছে। পডবার সময় মনে হয় যেন বইয়ের পাতায় সকালের আলো এসে পড়েছে। প্রথম বিস্ময়েব চোখে শান্তিনিকেতনকে ফিরে দেখি, বিদ্যায়তনের দুটি-চারটি কুটীর, পাঠভবন, শালবীথি আম্রকুঞ্জে ঘেরা প্রাত্যহিক কর্মশীল জীবনের নানা দৃশ্য চোখে পড়ে। ছবিতে দেখা যায় উঁচু নীচু খোয়াই ছাড়িয়ে উজ্জ্বল দিগন্ত, কখনো মেঘের ছায়া, কখনো খররৌদ্রস্নাত গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতন। সান্ধ্যসভায় কবি সদ্যরচিত কাব্য প'ডে শোনাচ্ছেন, কখনো তিনি গভীর আলোচনায় নিযুক্ত, হাস্যে কৌতুকে তাঁর অজস্র উৎসাহিত প্রাণশক্তি ঝরে পড়ছে। তারপর দেখা দিল আশ্রমেব বহুশাখায়িত জীবন, বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা, দেশ বিদেশের বিদ্বজ্জন অতিথি সমাগম।

ইতিহাসের মূলে যে প্রাণের প্রবর্তনা আছে তারই পরিচয় পাই এই গ্রন্থে, তথ্যের তালিকা যথানুপূর্বিক দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বভাবের কথা নানা প্রসঙ্গে আপনি ফুটে উঠেছে,

তাঁর কথাবার্তার উজ্জ্বল অনুলিখিত অংশে মনকে চমকিয়ে দেয়। রবীন্দ্র চারিত্রের প্রশস্তি এই বইয়ে যথাযথভাবে বীর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং অন্যান্য রচনাবলীর আলোচনাও বিশেষ উপভোগ্য, যাঁরা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এই জ্ঞানগভীর রচনাটি পাঠ করবেন রবীন্দ্র সাহিত্যের বহু তোরণ তাঁদের সম্মুখে খুলে যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমিয় চক্রবর্তী

প্রবন্ধ সূচী

পরিশিষ্ট

চিত্র সূচী

আত্মপরিচয়

কবি স্বর্গগত। তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার আশ্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে তাঁহার সাহচর্য্যে দীর্ঘকাল—আমার জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ, অতিবাহিত হইয়াছে। আশ্রমে কবির নিকট এই দীর্ঘ বাসে আমি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা আমার অন্তিম জীবনপথের আমরণান্ত সারবান্ পাথেয়—অমূল্য রত্ন। অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিলে বুঝিতে পারি, কবির আশ্রয় পাইয়া সংসারের শিক্ষণীয় নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি। জীবনের এই নানা বিষয়ে উৎকর্ষ সজ্জনসঙ্গতির—কবির আশ্রমে আশ্রয় লাভের সুফল। আমি সামান্য অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তি, এই মহদাশ্রয়ের কথা আমি কখনও ভাবি নাই—সে ভাবনায় আমার অধিকারও ছিল না—ইহা স্বপ্নের অগোচর বিষয়। ইহা ভাগ্যচক্রের আবর্ত্ত ফল, কি ঘটনাচক্রের ঘটনা-পরম্পরার পরিণাম, তাহা বলিতে পারি না—যে চক্র চালনের ফলেই হউক, চক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে কবি চক্রবর্ত্তীর চরণে চরম আশ্রয় পাইয়াছিলাম, ইহাই বলিতে পারি। তাই মনে হয়, ভবিতব্যতা বলসর্বাতিরিক্ত সে আপনার পরিণতি শুভই হউক, আর অশুভই হউক, সকল বাধাবিঘ্ন সর্ব্বাতিশায়ী শক্তিতে অভিভূত করিয়া সংঘটিত করিবেই করিবে—তাহার সেই পরিণতির পক্ষে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আমার এই মহদাশ্রয় লাভ সেই ভগবতী ভবিতব্যতার সুপরিণাম সুমঙ্গল ফল। এই ফলের ক্রমপরিণতির বিষয় এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

আমার বড়দাদা (পিসতুতো ভাই) স্বর্গগত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষিদেবের জোড়াসাঁকোর বাটীতে সদর বিভাগে খাজাঞ্চির কার্য্য

করিতেন। সুদূর পল্লীগ্রামে ছাত্রজীবনে আমি যখন হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যার্থী, তখন সুবিধামত ছুটিতে কলিকাতায় বড়দাদার কাছে আসিতাম। যে কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিতাম, বড় দাদার অফিসে যাতায়াত আমার প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল। প্রায় সমস্ত অপরাহ্ণ এই অফিসেই্ কাটিত। এই সময়ে বড়দাদার কাছে কবির বিদ্যোৎসাহিতা বিদ্যানুরাগিতার কথা—কবিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা ও উদার কবি-চরিত্রের নানাবিষয়ক কথা—তন্ময় হইয়া আনন্দের সহিত শুনিতাম।

আমার পিতাঠাকুর দরিদ্র ছিলেন, অতি কষ্টে আমার লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করিতেন, বড়দাদা ইহা জানিতেন। একদিন তিনি কবির নিকট এই বিষয় জানাইয়া, আমার লেখাপড়ার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার এইরূপ সাহায্যপ্রার্থনায় কবি তাঁহার নিকটে আমাকে লইয়া যাইতে বলেন। আমি তখন বড়দাদার অফিসেই ছিলাম, ইহার কিছুই জানিতাম না। বড়দাদা আসিয়া আমাকে সকল কথা বলিয়া কবির নিকটে লইয়া গেলেন। কবি তখন স্বর্গীয় দ্বিপুবাবু মহাশয়ের সহিত দোতালার একটি ঘরে জাজিমপাতা বিছানায় বসিয়াছিলেন। আমি বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে, কবি আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন—আমি কবির নিকটে এক পাশে বসিলাম। কবি তখন আমাকে লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমার তাহা মনে নাই। যাহা হউক, পরে শুনিলাম, কবি আমাকে মাসিক কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন। সাহায্যের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাতে পিতাঠাকুরের কিছু ভার লাঘব হইল; ছাত্রজীবনের পথও কিছু অবাধ হইল। কিন্তু বিশেষ আনন্দের কারণ—কবির সহিত আমার সাক্ষাৎকার। আমি পল্লীবাসী মূর্খ বালক—অনায়াসে সৎকবির দর্শনলাভ হইল, তাঁহার কৃপাপাত্র হইলাম—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। মনে হইতেছে, তখন আমার

মনে কিছু সৌভাগ্যগর্ব্বও হইয়াছিল। আমি দরিদ্র, কবির প্রদত্ত এই বৃত্তি আমাকে যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত আশা দিয়াছিল, তাহা অনুমানেরই বিষয়, বলিবার নয়। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, এই বৃত্তিই তাহার মূল দৃঢ় করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা কিছু বিদ্যালাভ হইয়াছিল, এই বৃত্তিই তাহার ভিত্তি।

কলেজে অধ্যয়নের ব্যয়বাহুল্য পিতাঠাকুর কষ্টেসৃষ্টে বহন করিতেছিলেন। পটলডাঙ্গার মল্লিকবাবুদের ছাত্রগণের সাহায্যার্থ একটি ফণ্ড ছিল। আমার দেশের এক বন্ধুর নিকট সন্ধান পাইয়া, কলেজের বেতনের নিমিত্ত ফণ্ডের সম্পাদকের কাছে আবেদন করিয়াছিলাম। এই দরখাস্তের সহিত কবিব একটি বাংলায় লেখা সার্টিফিকেট ছিল। তাহার কথাগুলি আমার ঠিক মনে নাই, তবে তাহার ভাবার্থ এইরূপ—"আমি এই ছাত্রটিকে শিক্ষার্থ কিছুদিন অর্থসাহায্য কবিয়াছি। ছাত্রটি কোন স্থানে সেই অর্থসাহায্য পাইলে বিশেষ সুখী হইব।" Indian Mirrorএর সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তখন ঐ ফণ্ডের সম্পাদক ছিলেন। দরখাস্তে ক্যাম্বেলের Anatomyর (শরীরব্যবচ্ছেদ-শাস্ত্রের) অধ্যাপক চন্দ্রমোহন ঘোষ এম্. ডি. মহাশয়ের ইংরেজীতে লেখা একটি সার্টিফিকেট ছিল, কবির সার্টিফিকেট তাহার পরেই গাঁথা ছিল। সেন মহাশয় চন্দ্রমোহনের সার্টিফিকেট দেখিয়াই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কবির নাম করায়, তিনি কবির সার্টিফিকেট দেখিয়াই আবেদনপত্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন। আমি এই ফণ্ডের সাহায্য কিছুদিন পাইয়াছিলাম। কলেজে তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করিতে করিতে কোন কারণে ফণ্ডের সাহায্যে বঞ্চিত হইলাম। পাঠ্য পুস্তকেরও অভাব হইল। এইরূপ নানা কারণে এইখানেই আমার ছাত্রজীবনের শেষ ও সাংসারিক জীবনের সূত্রপাত হইল। আমি দরিদ্র, সহায়-সম্পত্তির বলে কোন কার্য্য ঠিক করিয়া লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল; যাহা কিছু

শিখিয়াছিলাম তাহারই বিনিময়ে পল্লীগ্রামের ও পরে কলিকাতার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতাম, তাহাতে পিতাঠাকুরের সংসারভার বহনের ক্লেশ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইয়াছিল।

একদিন অফিসে বড়দাদার মুখে কথাপ্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে কবিব প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা শুনিলাম। ছাত্রজীবনে আমাব একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমি যেখানেই যে কার্য্যেই থাকি না কেন, বিদ্যালোচনা বিশেষতঃ সংস্কৃতের চর্চ্চা কখনও ত্যাগ করিব না। এই জন্যই আমি সর্ব্বদাই শিক্ষা বিভাগের কার্য্যেরই পক্ষপাতী ছিলাম। বড়দাদা বলিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপকগণ পরম সুখে অধ্যাপনা করেন। প্রভুর সমদর্শিতায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি শ্ববৃত্তি বলিয়াই বোধ হয় না, অধ্যাপনাদি সকল কার্য্যেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আহারের বিষয় পরাধীনতা থাকিলেও, তাহা সুখকর ও স্পৃহণীয়, কারণ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রত্যহই নিয়মিতভাবে সুখভোগ্য আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। শিক্ষকতায় পরাধীনতার তীব্র আস্বাদেব সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলাম, সুতরাং ঐরূপ স্পৃহণীয় অধ্যাপকাদির বিষয় শুনিবামাত্রই, আমার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনাব স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু আমার বিদ্যাবত্তাব গভীরতা অল্প, আমি সে আশ্রমে অধ্যাপকমণ্ডলীতে "হংস মধ্যে বকো যথা"; সুতরাং আমার সে স্পৃহা উদ্বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফলপ্রাপ্তির আশার ন্যায় নিতান্তই উপহাসাস্পদ; এইরূপ নানা কারণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনায় নিজ বিদ্যাবত্তার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া আমি দুরাকাঙ্ক্ষ মনকে কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত ও শান্ত করিলাম। তখন জানিতে পারি নাই যে, আমার ভাগ্যবিধাতা আমার পরোক্ষে "তথাস্তু" বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় আমার সেই অলীক আশা সফল করিতে উদ্যত হইযাছেন। ইহার কিছুদিন পরে আমার বড়দাদা একদিন কবির নিকটে তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত

বৃত্তির উল্লেখ পূর্ব্বক আমার পরিচয় দিয়া, জমিদারীতে মফস্বলে আমার জন্য একটি কার্য্যেব প্রার্থনা করিলে, কবি তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন এবং তদানীন্তন সদর নায়েব অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকাইয়া মফস্বলে কোন একটি পরগনার কায্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই আমি কার্য্য পাইলাম। আমি কালীগ্রাম পরগনার সদর কাছারী পতিসবে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্ হইলাম। তখন শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কালীগ্রামের ম্যানেজার ছিলেন। ১৩০৯ সালে শ্রাবণের প্রথমে আমি পতিসরের কাছারীতে কায্যার্থ উপস্থিত হইলাম। তখন ভযানক বর্ষা। পতিসরের চারিদিকে দূরদূরান্ত দিগন্তব্যাপী প্রান্তর বর্ষার ভয়ঙ্কর মহাপ্লাবনে একাকার হইয়া গিয়াছে, কোথাও কিছুই দেখা যায় না; কেবল বহুদূর-ব্যাপী নিমগ্নপ্রায় ঘনসন্নিবিষ্ট হরিত ধান্যশীর্ষসমূহ, আর সেই হরিতসাগরের মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে দূর হইতে প্রতীয়মান গ্রামবাসীর তৃণাচ্ছাদিত গৃহসমূহেব পঞ্জরনিকর। এইরূপ ভীষণ বর্ষায় ম্যানেজারবাবু আমাকে মফস্বলে যাইতে দিলেন না—আমি কাছারীতেই কিছু কিছু কাজ করিতে ও শিখিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল।

কবি এই সময়ে জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একদিন কর্ম্মচারীদিগের নিকটে শুনিলাম, শ্রীযুত বাবু মহাশয় (অর্থাৎ কবি, কর্ম্মচারীরা কবিকে 'বাবু মশায়' বলিতেন) শিলাইদহে আসিয়াছেন, দুই একদিনের মধ্যেই জলপথে এখানে আসিবেন। প্রভুব সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকারের সুযোগ হইবে ভাবিযা আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পরদিন শুনিলাম শ্রীযুত বাবু মহাশয আসিতেছেন, অদূরে বোটের মাস্তুল ধান্যশীর্ষ ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, অবিলম্বেই বোট ঘাটে আসিয়া লাগিবে। সকলেই দেখা করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন, আমিও দেখাদেখি প্রস্তুত হইলাম। এদিকে যথাকালে

বোট ঘাটে আসিয়া লাগিল। কর্ম্মচারীরা পদগৌরবানুসারে অগ্র-পশ্চাদ্‌ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বোটের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। সকলেই ক্রমে ক্রমে বোটেব মধ্যে গিয়া যথারীতি প্রভুর পাদবন্দনাদি করিলেন, আমিও সামাজিক নিয়মে সবিনয়ে ভক্তিভাবে প্রণতি করিলাম। আমি নূতন কর্ম্মচাবী সুতরাং এথন প্রথম সাক্ষাৎকাবে আমার সহিত বিশেষ কথোপকথনেব সম্ভাবনা নাই—দুই একটি কুশল প্রশ্নাদির পরে, আমি পূর্ব্ববৎ প্রণতি করিষা বিদায লইয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন—"বাবু মশায আপনাকে ডাকছেন, আসুন"। এইরূপ অপ্রত্যাশিত আহ্বানে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গেই বোটে গিয়া কবির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কবি স্বাভাবিক মৃদু-মধুর বাক্যে আমাকে বসিতে অনুমতি দিলেন, আমি বসিলাম। তথন তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি এথানে কি কর?" আমি বলিলাম—"আমিনেব সেবেস্তায় কাজ করি।" ইহার পরে বলিলেন,—"দিনে সেরেস্তায় কাজ কর, রাত্রিতে কি কব?" আমি বলিলাম,—"সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি ও কিছুক্ষণ একথানি বইএর পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসেব কপি (press copy) প্রস্তুত করি।" পাণ্ডুলিপির কথা শুনিয়া কবি উহা দেথিতে চাহিলেন। আমি ঘরে আসিয়া পাণ্ডুলিপি লইযা গিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কিছুক্ষণ দেখিয়া কবি আমাকে পাণ্ডুলিপি ফিবাইয়া দিলেন, কিছুই বলিলেন না। আমি বিদায় লইয়া ঘরে আসিলাম।

এইরূপে পতিসবের কাছারিতে শ্রাবণ মাস অতীত হইল। ভাদ্রের প্রথমে একদিন ম্যানেজারবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—বাবু মহাশয় আপনার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"শৈলেশ, তোমাব সংস্কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীকে এইথানে পাঠাইয়া দাও। এ বিষয়ে আপনাব মত

কি? বলাবাহুল্য, আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্বভাবের অনুরূপ হয় নাই, সুতরাং ঐরূপ অচিন্তিত সুসংবাদ শুনিয়াই আমি আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলাম, ভাবিলাম আমার আন্তরিক প্রার্থনা বুঝি ভগবদিচ্ছায় পূর্ণ হইতে চলিল। শৈলেশ-বাবু আমাকে বলিলেন, "তবে যাইবার জন্য উদ্যোগী হন, এখনই যাইতে হইবে। আমিও প্রস্থানের জন্য সজ্জিত হইলাম এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া নৌকায় আত্রাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী পাইলাম এবং রাত্রি (বোধ হয়) দশটার মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কার্য্য থাকিলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি কলিকাতায় অপেক্ষা করিলাম না, পরদিনই সকালের গাড়ীতেই শান্তিনিকেতনে অতিথিশালায় আসিয়া কবিকে আমার আসার সংবাদ জানাইলাম। কবি উপরে থাকিতেন, শুনিয়াই নীচে আসিলেন, কবির সহিত দেখা হইল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কবি আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে আনিয়া পরিচয় দিয়া স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া গেলেন। এতদিনে আমার আশা সফল হইল—আমি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক হইলাম। কিছুদিন অধ্যাপনার পরে, একদিন কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিচরণ, তুমি কি এই স্থানেই অধ্যাপনা করবে, না পতিসরে ফিরে যাবে?" আমি উত্তরে জানাইলাম—"আশ্রমের কাজ আমার ভালই লাগছে, আমি আর পতিসরে যেতে ইচ্ছা করি না।" কবি শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন,—"বেশ! তবে এইখানেই থাক।" আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তদবধি আমি এই আশ্রমের অধ্যাপক ছিলাম।

আমি যখন কলেজের বিদ্যার্থী ছিলাম, তখন পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট কাব্যাংশ ভিন্ন অন্য সংস্কৃত কাব্যের সহিত আমার পরিচয়ের অবসর হয় নাই।

কোন সংস্কৃত কোষের বা পাণিনির পূর্ণগ্রন্থ আমি দেখি নাই—টীকায় উদ্ধৃত খণ্ডিত কোষাংশ ও পাণিনির সূত্রাংশই দেখিয়াছিলাম, সুতরাং আশ্রমের পুস্তকালয়ে সম্পূর্ণ সংস্কৃত কাব্য কোষ ও সমগ্র পাণিনি পাইয়া আমি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। তখন উৎসাহের সহিত ঐ সকল চিরকালের অভীপ্সিত পুস্তক পড়িয়া নূতন নূতন বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময়ে কবির নির্দ্দেশানুসারে বালকগণের অধ্যাপনার্থ আমি "সংস্কৃতপ্রবেশ" রচনা করিতে আরম্ভ করি। কবি এই সময়ে কয়েক পৃষ্ঠার সংস্কৃত-পাঠের পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়াছিলেন। "সংস্কৃতপ্রবেশ" ঐ পাণ্ডু-লিপির প্রণালী অনুসারেই বিরচিত। এই পুস্তক রচনার সময়ে কবি একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বাঙ্‌লা ভাষার অভিধানসঙ্কলনের কথা বলেন। "সংস্কৃত প্রবেশ"এর তিন খণ্ডের রচনা শেষ করিয়া, আমি কবির পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে ১৩১২ সালে অভিধানের কার্য্য আরম্ভ করি। অভিধান সঙ্কলনের কার্য্যে কেহই আমার সহকারী ছিলেন না। নিজেই গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্‌লার পুস্তক যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, তাহা পড়িয়া শব্দ, বাক্যাংশ (phrase) সংগ্রহ করিয়া সংগৃহীত শব্দ সমূহ সংস্কৃত শব্দের সহিত মাতৃকাবর্ণানুক্রমে সাজাইয়া অভিধান আদ্যোপান্ত নিজের হাতেই লিখিয়াছি, ইহাতে কাহারও এক বর্ণেরও সাহায্য পাই নাই। অভিধানের লেখার কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে আর্থিক অসঙ্গতির কারণে আমাকে কলিকাতার কোন কলেজে কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় সঙ্কলিত অভিধানের কার্য্য বন্ধ হওয়া যায়। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী হইলেও, আমার এ দুঃখ নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না—কেবল অবসরক্ষণে মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়া কবির নিকটে মনের বেদনা জানাইয়া গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিয়া আসিতাম।

RPP No.

PHONE NO 647 BURR

VISVA-BHARATI

10 CORNWALLIS STREET

Calcutta 192

ওঁ

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত
বিশ বৎসর ধরিয়া বাংলার অভিধান রচনায়
নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত
হইয়াছে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান
বাংলায় নাই। এই পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে
প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিতেছি।
এই বৃহৎ কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকাশসামগ্রী
সুসাধিত হইয়াছে। বাংলা দেশের সর্ব্বসাধারণ
এই কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া বাংলা
সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিবেন একান্তমনে
ইহাই কামনা করি।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭ সেপ্টেম্বর
১৯২৪

সহৃদয় মহাত্মার নিকটে কোন সদ্বিষয়ের নিবেদন ব্যর্থ হয় না,—আমার বেদনার নিবেদন সার্থক হইল—কবির মন বিচলিত হইল। তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া অভিধানের বিষয় জানাইয়া, বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলিলেন; মহারাজও তদনুসারে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিবেন, স্বীকার করিলেন। এইরূপে আমার অর্থাভাবের মীমাংসা হইলে, কবি দেখা করার জন্য আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্ব্বপ্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবি ভিক্ষুবেশে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-নিবেদনেব চেষ্টা কবিলাম, কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না—কেবল নির্বাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম—দরবিগলিত অশ্রুধারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিল, নত হইয়া কবির পদরজ মস্তকে ধাবণ করিলাম। কবি আমার হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পাবিলেন—ধীব সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—"স্থির হও, আমার কর্ত্তব্যই করেছি"। আমি আর কিছুই বলিলাম না—পাদস্পর্শ কবিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

যে দিন বৃত্তিব ব্যবস্থা কবিব নিকট শুনিয়াছিলাম, সেই দিন কবি আমাকে বলিযাছিলেন,—তোমাব কাছে অভিধানের যে পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি আছে, তাহা লইযা কাল সকালে মহারাজের সহিত দেখা করিবে, তিনি পাণ্ডুলিপি দেখিতে চাহিয়াছেন। আমি কবিব আদেশানুসারে পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার হাতে পাণ্ডুলিপি দিলাম। তিনি দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সঙ্কলিত এই অভিধান কতদিনে শেষ হইবে মনে করেন? আমি বলিলাম, তাহা এখন বলা কি সম্ভব? মহারাজ বলিলেন, এই

পাণ্ডুলিপিতে কত সময় লাগিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া তদনুসারে একটা মোটামুটি হিসাবে একটা সময় নির্ণয় করিয়া কাল আমাকে বলিবেন— তাহা হইলেই হইবে। আমি ইহাতে চিন্তান্বিত হইলাম, দুই একটি বন্ধুকেও ইহা জানাইলাম। বন্ধুদের পরামর্শ আমার অভিমত হইল না, ভাবিলাম আমার হিসাবে যে সময় লাগিবে, ঠিক তাহাই মহারাজকে বলিব। বৃত্তিলাভের লোভে মিথ্যা বলিব না। আমার হিসাবে দেখিলাম, অভিধান প্রায় নয় বৎসরে শেষ হইতে পারে, তাহাই স্থির করিলাম।

পরদিন মহারাজের সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, অভিধান শেষ করিতে আমার হিসাবে প্রায় নয় বৎসর লাগিবে। মহারাজ বলিলেন,— আচ্ছা, তবে কাজ আরম্ভ করুন। ইহার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —তাহা হইলে কাশিম বাজারে কখন যাইতেছেন? আমি এই অতর্কিত প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম,—"শান্তিনিকেতন-লাইব্রেরির সকল বই আমার দেখা আছে, সেখানে থাকিয়া কাজ করিলে বিশেষ সুবিধা হয়।" মহারাজ বলিলেন, আমার বড় লাইব্রেরী আছে, সেখানেও আপনার কোন বইএরই অভাব হইবে না, অবাধে কাজ করিতে পারিবেন। আমি মহারাজকে এ বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়া নীরবে বিদায় লইলাম।

পরদিন কবির সহিত দেখা করিয়া কাশিমবাজারে আমার থাকার কথা বলিলাম। তিনি এ বিষয়ে আর কোন কথাই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, তুমি কালই শান্তিনিকেতনে যাও, আমার বিদ্যালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। মহারাজের সহিত দেখা করিয়া আমি সে ব্যবস্থা করিব, তুমি চিন্তা করিও না। আমি আর কিছু বলিলাম না, প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

পরদিনই আমি কবির অনুমতি অনুসারে পুনর্ব্বার আশ্রমে আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলাম এবং বৃত্তিলাভে উৎসাহিত

হইয়া বহুদিনের পরে অভীপ্সিত অভিধানের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ মনোনিবেশ করিলাম। এই সময়ে একদিন অভিধানের কথাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন,—"মহারাজের প্রদত্ত এই বৃত্তিলাভ ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অভিধান সমাপ্তির পূর্ব্বে তোমার জীবনের আশঙ্কা নাই।" কবি গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল—ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ১৩৩০ সালে ১১ই মাঘ অভিধানের সঙ্কলন কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলাম।

ইহার পরে দীর্ঘকাল নানা বাধাবিঘ্নে অভিধানের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিতে পারি নাই। এই সময়ে সংশোধন পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া অভিধানের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার লিখিয়াছিলাম। অবশেষে ১৩৪০ সালে বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয় এবং তদবধি প্রতিমাসে খণ্ডে খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

কবির সহিত আমার পরিচয় কিরূপে হইয়াছিল এবং সেই পরিচয়ে কি ফল হইয়াছে—এই বিষয় লইয়াই আমি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার বক্তব্য যে, উপরিলিখিত ঘটনাপরম্পরা আমার সে অভিপ্রেত বিষয়সিদ্ধির অনুকূল হইবে, বোধ হয়।

আমার বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, যাঁহার প্রদত্ত বৃত্তি পাথেয়রূপে মাসে মাসে আমাকে নব নব উৎসাহ দিয়া আমার কঠোর সুদীর্ঘ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সামর্থ দিয়াছিল, সেই দানবীর মহাত্মা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পরলোকগত, তাঁহার অভীষ্ট অভিধান মুদ্রিত আকারে তাহাকে সমর্পণ করিবার সৌভাগ্যের দিন আমার জীবনে আসিল না। এক্ষণে তাহার স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশেই আমার এই মনোগত ভাব নিবেদন করিয়াই শান্তিলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার সহিত পরিচয়ে আমি নানা প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছি—যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় উৎসাহিত হইয়া এই অভিধান সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম—যাঁহার

সংসর্গগুণে আমার মানসিক মালিন্য অপনীত ও নবজন্মলাভ হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ পিতৃবৎ ভক্তিভাজন কবিগুরুর করকমলে মুদ্রিত অভিধান সম্পূর্ণ আকারে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখের আশীর্ব্বাদ লাভ করার সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না—ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়।

এক্ষণে এই কবিবচনই এই শোকসান্ত্বনালাভের একমাত্র উপায় :—

"তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ॥"

উপসংহারে বক্তব্য, আমি কবির নিকটে যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, যেন সেই ঋণস্মৃতি আমরণ আমার অন্তরে জাগরূক থাকিয়া, চিত্তকে তদভিমুখে ভক্তিপ্রবণ করিয়া রাখে—ইহাই এক্ষণে ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা।

গুণস্মৃতি

১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের কথা—আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে কিরূপ ঘটনাচক্রে কবির আহ্বানে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছি। সেই সময়ে আশ্রমের বিদ্যালয়—ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠার দিবস। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সিন্ধুদেশবাসী রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায়—এই চারি জন তখন আশ্রমের অধ্যাপকমণ্ডলী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র নাথ—এই পাঁচ জন তখন আশ্রমের ছাত্র। পর বৎসর আশ্রমে আসিয়া জগদানন্দ রায়কে দেখিয়াছি, পণ্ডিত শিবধনকে তখন অধ্যাপনা করিতে দেখি নাই—আমার আসার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ছাত্রগণের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ, প্রেমকুমার, অশোককুমারকে দেখিয়াছি—অন্য ছাত্রগণের কথা মনে হয় না। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সুবোধচন্দ্র মজুমদাব—ইঁহারা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের অধ্যাপকমণ্ডলী। তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা চৌদ্দ পনরটি, মনে হয়। রথীন্দ্রনাথ, প্রেমকুমার অশোককুমার তাহাদের অন্যতম। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আশ্রমের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী আশ্রমের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

এই সময়ে অধ্যাপকগণের ও ছাত্রবর্গের বাসার্থ আশ্রমে একটিমাত্র কুটীর ছিল। ইহাই প্রথম কুটীর—'প্রাক্‌কুটীর'। পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত এই কুটীর তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল, পূর্ব্ব ও মধ্য প্রকোষ্ঠ এখনও পূর্ব্ববৎ আছে। পশ্চিমের প্রকোষ্ঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অতিদীর্ঘ

ছিল, ইহা ছাত্রাবাস। ইহার পূর্ব্বভাগে আড় দেয়ালের পাশেই আমাব স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রাক্‌কুটীরের পশ্চিমে গ্রন্থাগার—ইহাও তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ইষ্টকালয়। কবি তখন শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতলে বাস করিতেন। গ্রন্থাগারের পূর্ব্ব প্রকোষ্ঠে তাঁহার লেখাপডার সাজসরঞ্জাম সমস্তই থাকিত—এইখানেই লেখাপডার কাজ চলিত। পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠদ্বয় গ্রন্থাগার। মধ্যের কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে দেয়ালের নিকটে বইএর র‍্যাক্, মধ্যে শতরঞ্চি-পাতা বসিবার স্থান। পশ্চিমের কুটীর কেবল গ্রন্থাগার। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা (Entrance Examination) ছিল। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র আশ্রমের প্রথম পরীক্ষার্থী ছাত্র। ইহাদের অধ্যাপনা এই স্থানেই করিতাম। অন্য ছাত্রগণের অধ্যাপনার স্থান গাছতলাই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

প্রাক্‌কুটীরে আমার যে স্থান ছিল, তাহারই নিকটে জানালাব কাছে একটি ছোট টেব্‌ল্-হারমোনিয়ম ছিল। কবি সন্ধ্যার সময়ে এই স্থানে আসিতেন, বালকেরাও তাঁহার সঙ্গে আসিত। বালকগণেব প্রতি কবির পুত্রবৎ স্নেহ ছিল। বালকেরা তাহা বেশ বুঝিত এবং পিতার পার্শ্বে পুত্রগণের ন্যায় তাহারা কবির চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আনন্দে কবির গানে যোগ দিত। ইহার ফলে, একদিকে বালকদিগের যেমন সংগীতশিক্ষা হইত, পক্ষান্তরে কবিব সাহচর্য্যে তাঁহার প্রতি তাহাদেব সেইরূপ অনুরাগ ও আসক্তিও বৃদ্ধি পাইত। এই বিনোদনের সময় উপভোগ করাব আনন্দ বালকগণের বিকসিত মুখচ্ছবিতে সুপ্রকট হইয়া উঠিত। কবির সম্মেলনে বালকদিগের এই আনন্দের ছবি এক অপূর্ব্ব চিত্রপট। এ চিত্র আমার পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব—আমার বড ভাল লাগিত, আমি তন্ময় হইয়া দেখিতাম। এই বালক গায়কদলের এখন একটিমাত্র ছাত্রকে জানি—সে অশোককুমার, ডাকনাম—'কালী'।

এই বালকগায়কগণ কবির সঙ্গে যে সকল গান গাহিত, তাহার সকলগুলি মনে নাই, দুইটি গানই বেশ মনে আছে ;—

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায়, তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে
প্রাণ করে হায় হায়।"—ইত্যাদি।
"ঘাটে ব'সে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়।
সে বাতাসে তরী ভাসাব না
যাহা তোমা পানে নাহি বয়॥"—ইত্যাদি॥

[পরে এই গানের পর্ব্ব 'বিনোদনপর্ব্বে' পরিণত হয়—কবির নির্দ্দেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে অধ্যাপকেরা পর্য্যায়ানুসারে কথাচ্ছলে হাস্যকৌতুকজনক হিতকর নানা গল্প বলিয়া ছাত্রগণের চিত্তবিনোদন করিতেন।]

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও শারীরিক মানসিক উন্নতির বিষয়ে কবির বিশেষ দৃষ্টি ছিল অধ্যাপকদিগেরও স্বাস্থ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। তিনি জানিতেন, প্রভুর প্রতি কর্ম্মীর সানুরাগ আসক্তি না থাকিলে, কোন কার্য্য সুশৃঙ্খল সহজসাধ্য হয় না—কর্ম্মীও কার্য্যসাধনে তাদৃশ প্রীতি প্রাপ্ত হন না। এই হেতু তিনি কখনও বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার বিষয়ের নিয়মাবলীতে হস্তার্পণ করিতেন না, অধ্যাপকেরাই সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ পাঠ্যবিষয়ের সময়ের তালিকা স্থির করিয়া লইতেন। ইহার ফলে অধ্যাপকেরা স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত প্রত্যহই ছয় সাত ঘণ্টা পাঠনা করিতেন, কিছুমাত্রও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। ইহা আমার নিজেরই অনুভূত বিষয়।

আশ্রম কবির গৃহস্থাশ্রমই ছিল, তাই গৃহীর ন্যায়ই সকলেরই স্বাস্থ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই মনোগত

শুভানুধ্যান যে প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে আমার নিকটে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিব।

আজ-কাল অধ্যাপকগণের ও ছাত্রবর্গের বনভোজন (picnic) উৎসব প্রায়ই দেখা যায়। আশ্রমের প্রথমাংশে বনভোজনের এরূপ বাহুল্য না থাকিলেও, একেবারেই ইহার অসদ্ভাব ছিল না। আমার আশ্রমে যোগদানের কিছুকাল পরে একদিন অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে লইয়া বনভোজন উৎসব উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া কবির নিকটে প্রস্তাব করিলেন। তখন কার্ত্তিকমাস—কার্ত্তিকের হিম সকলেরই, বিশেষতঃ বালকদিগের বিশেষ অপকারক। এই ভয়েই, কবি প্রথমে এইরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই, কিন্তু একেবারেই এই উদ্যোগ রহিত করিয়া সকলকে ইহার আনন্দে বঞ্চিত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, এই হেতু বনভোজনে অনুমতি দিয়া বিশেষভাবে বলিলেন,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বালকগণকে লইয়া সকলকেই আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে। সকলে তাহাই স্বীকার করিয়া বনভোজনে উদ্যোগী হইলাম। আশ্রমের পূর্ব্ব-দিকে রেল রাস্তার অপর পার্শ্বে পারুলবন বনভোজনের স্থান নির্ণীত হইল। পাচক ও ভৃত্যেরা প্রয়োজনানুরূপ আহাবসামগ্রী প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদিগকে লইয়া পরে আমরা পারুলবনে উপস্থিত হইলাম। কবির নির্দ্দেশানুসারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে উপস্থিতিব একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল—রাত্রি কিছু অধিকও হইয়া গেল। রথীন্দ্রনাথ সঙ্গে ছিল, তাহার অনুপস্থিতিতে কবি সকলেরই বিলম্ব বুঝিতে পারিলেন। কথানুসারে কার্য্য না হওয়ায়, আমরাও বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিলাম, বিশেষতঃ বালকদিগের নিমিত্ত উদ্বেগের সীমা ছিল না। কবিও স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া, প্রাক্‌কুটীরের নিকটে প্রতিক্ষণই উৎসুকভাবে আমাদের আসার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভবিষ্যৎ অসুস্থতার আশঙ্কায় ভৃত্যকে চা

প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, আশ্রমে আসিলে সকলকেই চা ও কুইনিন খাওয়াইতে হইবে। আমরা অপরাধী, এই সময়ে আমরা নীরবে বালকদিগকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই ভৃত্যের নিকটে কবির আদেশ জানিতে পারিলাম। কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া আমরা ভয়ে ভয়ে নিজ নিজ স্থানে নিঃশব্দে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। চা-পায়ীদিগের তাদৃশ অনুকূল প্রতিবিধানে বাঙ্‌নিষ্পত্তির কোন কারণ ছিল না, তাঁহারা আগ্রহপূর্ব্বক উষ্ণ চায়ের পেয়ালা পরম সুখে নিঃশেষ করিয়া কবির আদেশ আংশিক প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কিন্তু কুইনিন সেবনের ব্যবস্থায় সেই অর্দ্ধাঙ্গ কবিবাক্যপালন পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল কি না, জানি না।

কবি স্বভাবতই প্রিয়ংবদ ছিলেন। কোন অপ্রীতির কারণ উপস্থিত হইলেও, তিনি আত্মসংযম রক্ষা করিয়া অপরাধীকে স্নিগ্ধবাক্যে এমন মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতেন যে, অপরাধী বিরক্ত ত হইতেনই না, বরং স্বীয় দোষের জন্য লজ্জিতই হইতেন। এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকই ভুক্তভোগী।

কবি প্রতি বুধবারে মন্দিরে সান্ধ্যোপসনা করিতেন, অধ্যাপকগণ ছাত্রবর্গের সহিত মন্দিরে সমবেতভাবে উপাসনায় যোগ দিতেন। একদিন, জানি না কি কারণে, কবি কিছু অশান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মন্দিরে বক্তৃতার সময়ে অসংযত হইয়া সাধারণভাবে অধ্যাপক-দিগের সম্বন্ধে দুই-চারিটি অপ্রিয় কথা বলিয়াছিলেন। উপাসনান্তে যখন তিনি অধ্যাপকদিগের সহিত প্রাক্‌কুটীরে আসিতেছিলেন, তখনও তাঁহার মনঃক্ষোভ সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। পথের পার্শ্বেই আমার বাসগৃহ ছিল, শাস্ত্রী মহাশয়ও (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রীও) আমার সহিত সেই ঘরে থাকিতেন। আমরা তখন সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়াছি। কবি আমার ঘর ছাড়িয়া দু-এক-পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আমার ঘরের নিকটে আসিয়া ডাকিলেন,—‘হরিচরণ’! কবির সেই অতর্কিত আহ্বানে আমি ‘আজ্ঞা’ বলিয়া সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া

দাঁড়াইলাম। কবি বলিলেন,—'তোমরা কি কেবল লেখাপড়া কত্তে আর পড়াতে এখানে এসেছ ? বুধবারে মন্দিরে আমরা সমবেত হই, এটা কি ভাল বোধ কর না ?' কবির এইরূপ অসম্ভাবিত প্রশ্নে আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম, বলিলাম, 'ইহা আমার সন্ধ্যাকৃত্যের সময়, এই কারণে যাওয়া সম্ভব হয় নাই'। কবি আর কিছুই বলিলেন না, চলিয়া গেলেন, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অধ্যাপকগণ বলিলেন,—'আজ কোন কারণে কবির চিত্তক্ষোভ হইয়াছে, মন্দিরেও সাধারণভাবে অধ্যাপকদিগের প্রতি তাঁহার এইরূপ ক্ষুব্ধভাব প্রকাশ পাইয়াছে।' শাস্ত্রী আপনার ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, সকলে চলিয়া গেলে, আমার কাছে আসিয়া বলিলেন,—'আমি কবির মন বেশ জানি ; এই কারণে উনি বিশেষ অশান্তি ভোগ করিবেন, এবং আপনাদের মনঃক্ষোভ দূর করিতে না পারিলে, উনি শান্তি পাইবেন না।' আমি আর কিছুই বলিলাম না।

পরদিন বৈকালে কবি অতিথিশালার দক্ষিণের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, আমি পিছনে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলাম, আর কেহই ছিলেন না। এই সময়ে তিনি বলিলেন,—'হরিচরণ, কাল বৈকালে কোন কারণে আমার মন অশান্ত ছিল, তাই সংযম রক্ষা কত্তে পারিনি, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলেছি, তুমি মনে কিছু ক'রো না, ভাববে এটা আমার চিত্তদৌর্ব্বল্য।' কবির এইরূপ সান্ত্বনার বাক্যে আমি প্রীত হইয়া বলিলাম,—'আপনার কথা স্বভাবতই মধুর, রাগ ক'রেও কিছু বল্লে তাতেও মাধুর্য্যের অভাব হয় না, এইজন্য আপনার রাগের কথায়ও আমার অপ্রীতির কারণ নাই, তবে অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন, তাই কিছু লজ্জিত হয়েছিলাম। আরও, আমরা প্রায় সর্ব্বদাই নানা কারণে আপনার বিরক্তিজনক হ'য়ে পড়ি, আপনি সংযতভাবে সমস্তই সহ্য করেন, আমরা যদি এতটুকু অপ্রিয় সহ্য কত্তে না পারি, তা হ'লে আপনার সাহচর্য্য পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নাই, আপনার উপদেশ আমাদের

কাছে উলুবনে মুক্তা ছড়ানর মতই হবে—এই মনে কর্বো। আপনি সে কথা মনে করে আর অশান্তি ভোগ করবেন না, ইহা আমার বিনীত প্রার্থনা।' কবি আর কিছু বলিলেন না।

অনুজীবীর প্রতি অপ্রিয় আচরণে ব্যথিত হইয়া এরূপ স্পষ্টভাষায় নিজের ত্রুটি স্বীকার, আমি কোন প্রভুর মুখে শুনিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না। কবি চরিত্রের এই মহত্ত্ব আমার জীবনের প্রথম ও চরম স্মরণীয় বিষয় হইয়া আমরণ থাকিবে।

"শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা"—নিগ্রহসমর্থেরই ক্ষমা ভূষণ। প্রভুকবি-চিত্তের অলঙ্কার এই ক্ষমা একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চিত্তসংযমের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই অভ্যুদয়ের পথে নানা বিঘ্ন-বিপদ্ থাকেই; সেই বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। এই আশ্রমের পক্ষেও সেই নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই; প্রতিকূল অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু কবির অসাধারণ ধৈর্য্যের নিকটে তাহা স্থির প্রতিবন্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই। স্রোতস্বতী স্রোতোবলে পথ নির্মুক্ত করিয়া সাগরে মিলিত হইবেই।

এই বিষয়ে একটি প্রতিকূল ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহা অনেক পূর্ব্বের কথা—তখনও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। আশ্রমের ছাত্রসংখ্যার সহিত অধ্যাপকের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। এই সময়ে কোন কারণে অধ্যাপকবিশেষের সহিত কোন কোন অধ্যাপকের অকৌশলের সৃষ্টি হয়; এই অকৌশল ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্বেষভাব ধারণ করে, সুতরাং আশ্রমের কার্য্যে কিছু বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। অল্পকালেই এই বিদ্বেষের কথা কবির কর্ণগোচর হইলে, ইহা আশ্রমের উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় জানিয়া কবি এক সভায় অধ্যাপক-গণকে আহ্বান করেন। সকলে সমবেত হইলে, কবি অভিযোগকারীকে

বিদ্বেষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করেন। দুইজন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন কারণ অনেক দফায় সেই সভায় প্রকাশ করেন এবং সেই সকল কারণের কোনটির প্রতিকূলে কিছু বলিবার থাকিলে, তাহা প্রকাশ করিতে অভিযুক্তকে আহ্বানও করেন। অভিযুক্ত দুই-একটি কারণ মিথ্যা বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু মিথ্যা কারণ স্বপ্রমাণ করিতে পারিলেন না। কবি উভয় পক্ষের বক্তব্য ধীরভাবে সবই শুনিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। আমি মনে করিতেছিলাম, এই সকল কারণে কবি নিতান্ত অশান্ত হইয়া না জানি কি প্রকাব প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া চিত্তসংযত করিয়া কবি শান্তভাবে স্বভাবমধুব মৃদু স্বরে বলিলেন—'সবই শুনলাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা তোমরা ক্ষমা কর—শান্ত হও। ক্ষমায় পরম সুখ—পরম শান্তি। এই আশ্রমেই আমি ক্ষমা ক'রে পবম শান্তি উপভোগ ক'রেছি। তাই বলি, তোমরা ক্ষমা কর—শান্তি পাবে।' কবির মুখে সেইরূপ অবস্থায় এইরূপ ক্ষমার কথা শুনিয়া তাঁহাব ধৈর্য্যের গভীরতা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলাম। মনে হইল এইরূপ শিক্ষার নিমিত্তই সংসারে মহতের সঙ্গতি নিতান্ত আবশ্যক। মহতেব সাহচর্য্য মহত্ত্বের পথে চরিত্র উন্নীত করে। কবি গাহিয়াছেন—

"সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে,
চির-অমৃতনির্ঝরে শান্তিরস-পানে ॥"

যে ঘটনাবলী এইরূপে আঘাত দিয়া কবিচরিত্রে প্রচ্ছন্ন গুণসমূহ প্রকাশ ও পরিস্ফুট করিয়াছে, তাহা আমার নিকটে কবির প্রত্যক্ষ জীবনচরিত। আমার সমসাময়িক অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ জীবিত থাকিতে পারেন, কিন্তু কবিগুণের পরিচায়ক ঘটনাগুলি তাঁহাদের মনে না থাকিতেও পারে, ইহা ভাবিয়াই তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

পূর্ব-স্মৃতি

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপনার কার্য্যে নিয়োগপ্রাপ্তির বার বৎসর পূর্ব্বে আমার শান্তিনিকেতনে আসার একবার সুযোগ হয়েছিল,—মন্দিরোৎসর্গের উৎসব। সেই উৎসবে অনেক মান্যগণ্য অতিথি এসেছিলেন। আমিও মহর্ষিদেবের প্রিয়স্থান প্রাণের আরাম শান্তিনিকেতনে আসার এই সুবিধা ছাড়তে পারিনি, বিশেষ উৎসুক হ'য়েই শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলাম। সে অনেক দিন পূর্ব্বেরই কথা, তখন কোন বিষয় বিশেষ করে দেখাব চোখ বা তত্ত্বানুসন্ধানের বুদ্ধি আমার ছিল না এবং এই উৎসবের বিষয় কিছু যে ভবিষ্যৎ জীবনে আমাকে লিখতে হবে, তাও ভাগ্য-বিধাতার লেখনীর ভাবী অধিকারেই ছিল, সুতরাং উৎসবের কিছু কিছু সাধারণ ভাবেই দেখেছিলাম মাত্র। তাও এখন ঠিক মনে করা সম্ভব নয়। উৎসর্গ-উৎসবের বিশেষ বিশেষ যা কিছু এখনও স্মৃতিরেখায় জেগে আছে, সেই কথা ও তৎকালীন আশ্রম-সংসৃষ্ট আরও কোন কোন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই প্রবন্ধের বিষয়।

মন্দিরোৎসর্গ উৎসব—১৩০৯ সালে ভাদ্রের প্রথমেই আমি শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এসেছিলাম। তার আগেও ১২৯৮ সালে মন্দিরোৎসর্গের উৎসবে এখানে আসার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল—আমার অচিন্তিত বিষয়ই। এখানে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি, তখন আমার ভাগ্যবিধাতাই জানতেন। মহর্ষিদেব আদেশ দিয়েছিলেন, এই উৎসবে যিনি যোগ দিতে ইচ্ছা কর্ব্বেন, তিনি যেতে পার্ব্বেন—রেলভাড়া, খাওয়ার খরচ সরকারী। আমার বড়দাদা মহর্ষির সরকারে খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, যদি তুমি এই উৎসবে যেতে ইচ্ছা কর, তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পার, ভাড়া

লাগবে না। এ সুযোগ আমি ছাড়িনি, তাঁর সঙ্গেই এসেছিলাম, সকালে সাতটার গাড়ীতে। তখন এ বোলপুরের পাকা রাস্তা ছিল না, মাঠের উপর মানুষ চলার পথই ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার আগে আগে তাঁর বৈবাহিক ললিতবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এসেছিলেন, বেশ মনে আছে। কবিও এসেছিলেন, উৎসবের প্রবন্ধ পাঠও করেছিলেন। তখন শান্তিনিকেতনে অতিথিশালা আর রান্নাবাড়ীই ছিল। উৎসবে অনেক অতিথি এসেছিলেন, বাগানের দক্ষিণে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড বাংলা-ঘর ছিল, তাতে বহু অতিথির স্থান হ'য়েছিল, তা ছাড়া বাগানের মধ্যেও একটা খুব বড় তাঁবু খাটান হ'য়েছিল, অতিথিরা ছিলেন। স্বর্গগত পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয়ও সগণে আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন। বিশেষ বিশেষ অতিথির সমাগমে উৎসর্গের উৎসব স্বাধ্যায়ে বক্তৃতায় গানে সকলেরই বেশ উপভোগ্য হ'য়েছিল—কোন অঙ্গহানি হয়নি। উৎসবের দিনে সকালে মন্দিরের চারিদিকে পৈঠার উপরে এক শ' সভোজ্য কম্বলের ডালা সাজান হ'য়েছিল, উৎসর্গের পরে এগুলি দরিদ্রদের বিতরণ করা হয়, বিকালে শান্তিনিকেতনের উঠানে দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এই উপলক্ষ্যে মেলার বাজার একদিন হত—বড় জমতো না।

আশ্রমের প্রারম্ভকাল—আশ্রমে এসে দেখেছি, মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা উপাসনা হ'ত, একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত উপনিষদের মন্ত্র পাঠ কত্তেন, দুইজন গায়ক, একজন খোল-বাদক ছিলেন। বোধ হয়, মন্দিরোৎসর্গের পর হ'তেই এ ব্যবস্থা চলে এসেছে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম সম্পত্তি একটি সুদীর্ঘ বাসগৃহ, উত্তর ও দক্ষিণ পাশে বারান্দা; তার পশ্চিমে, দক্ষিণে বারান্দাওয়ালা তিন কুঠরীর পাকা গ্রন্থাগার আর ছোট একটি পাকশালা। বাসগৃহের দক্ষিণে শালশ্রেণী আশ্রমের সীমা; তার পরেই মরুময় প্রান্তর। ঐ সীমার একটু দূরে পূবের দিকে একটা পাঁচীল-ঘেরা কাঁচা বাড়ী (শাল বাগানের

বাড়ী) ছিল। এর পূব দিকে অনতিঘন ছোট ছোট শালগাছের বাগান ছিল, ছেলেরা এখানে লুকোচুরি খেলত। আশ্রমের পশ্চিমে দূর—দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত বিপুল প্রান্তর—গাছপালার চিহ্নই ছিল না—মাঠ ধূ ধূ কত্তো—এখন বাগান, গাছগাছালি, বিশ্বভারতীর বাড়ীতে আর সাঁওতাল পল্লীতে প্রান্তরের সে নগ্নমূর্ত্তির চিহ্নও নেই—বিশেষ চেষ্টা করেই সে ভাব মনে আঁকতে হয়।

আশ্রমের কার্য্যের তত্ত্বাবধান কত্তেন কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী, তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। শিলাইদহে ছিলেন, কবি তাঁকে আশ্রমে আনেন। আবশ্যকমত তিনি সকলের চিকিৎসা কত্তেন। আশ্রমে এলে কবি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এঁর কাছে পরিচয় দিয়ে আমার সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা করার আদেশ দিয়ে যান। ইনিই আমার প্রথম পরিচিত আশ্রমবন্ধু, পরে অধ্যাপকগণের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় হয়।

জাপানী ছাত্র—পূর্ব্বে গ্রন্থাগারের যে তিনটি কুঠরীর কথা বলেছি, তার পশ্চিমের কুঠরীতে একটি জাপানী ছাত্র ছিলেন। তাঁর নাম হোরি। তাঁর স্বভাব যেমন সরল, ব্যবহারও তেমনি শিষ্টশান্ত, তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি সংস্কৃত পড়তেন। সমস্ত অমরকোষ নাগরী অক্ষরে নকল করেছিলেন, উদ্দেশ্য দেশে নিয়ে ছাপবেন। তাঁর পিতা জাপানরাজের পুরোহিতবংশসমূহের অন্যতমের সন্তান, তিনি পুরোহিতবংশেরই অনুরূপ সরল, ধার্ম্মিক, দয়ালু ছিলেন। হোরির কাছে তাঁর পিতার উদার প্রকৃতির পরিচায়ক যে ঘটনা শুনেছিলাম, তা এখানে বলবো।

এক রাত্রিতে তাঁর পিতা যখন শয়নকক্ষে ঘুমুচ্ছিলেন, তখন একটি চোর সেই ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে চোরের নড়াচড়ার মৃদু শব্দেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘরে আলো ছিল, তিনি উঠে বসলেন, দেখলেন ঘরে চোর। চোর তাঁকে উঠে বসতে দেখে পালিয়ে ঘরের বাইরে

গিয়ে লুকোল। তিনি তখন চোরকে ডেকে বল্লেন—তুমি যেই হও, আমার কাছে এস, কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে পুলিশে দেব না। আমার কথায় বিশ্বাস কর, কোন অনিষ্ট কর্ব্বো না। চোর তাঁকে ধার্ম্মিক সত্যবাদী বলে জানতো, কথায় বিশ্বাস ক'রে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। তিনি রুষ্ট না হ'য়ে সহজ কথায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, তুমি কেন চুরি কত্তে এসেছ, ঠিক ক'রে বলো। চোর তাঁর প্রশ্নে এইরূপ সহৃদয়তা ও সদয়ভাব দেখে আশ্বস্ত হ'লো, বল্লে,—মশায়, আমার ঘরে খাওয়ার কিছুই নেই, ছেলেপিলেরা উপোসে কাতর হয়ে পড়েছে, আর কোন উপায় নেই দেখে কিছু টাকার জন্যেই আপনার ঘরে ঢুকেছি; ঢুকতেই আপনি জেগেছেন। এ আপনাকে সত্যই বলছি। চোরের আকার প্রকারে কথায় তাঁর বিশ্বাস হলো, উঠে বাক্স হতে একখানা নোট বের ক'রে চোরকে দিয়ে বল্লেন,—বুঝলাম, তোমার কথা ঠিক, এই ১০৲ টাকার নোট তোমাকে দিলাম, এই টাকায় তোমার পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করগে; দিন-মজুরীতে তোমার সংসার খরচ না কুলোলে চুরি কত্তে যেও না, আমার কাছেই আসবে, আমি সাহায্য কর্ব্বো। চোর এইরূপ অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হয়ে গদগদ ভাবে বল্লে,—মশায়, আপনি আমাকে কুকর্ম্ম হতে রক্ষা কল্লেন। আপনি আমার গুরুতুল্য। —এই বলে ভক্তিনম্রভাবে প্রণাম করে' টাকা নিয়ে বিদায় হ'লো।

কবির হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠা—কবির হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধার বিষয় পূর্ব্বেও এক প্রবন্ধে কিছু লিখেছি। "স্মৃতি"তে প্রকাশিত একখানি পত্রে তিনি এ বিষয়ে যা লিখেছেন, তাই প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে এখানে উদ্ধৃত হ'লো—

"প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা কিছু সমাজ-বিরোধী, তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা

তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। ...ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?"

নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ—জগদিন্দ্রনাথ একবার আশ্রমে এসেছিলেন। সেই সময় পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব এখানে এসে প্রশস্তি-শ্লোক রচনা ক'রে বালকদের দ্বারা গান করিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নাটোররাজের ঘনিষ্ঠ সখ্য ছিল। একবার নাটোরের প্রাদেশিক সমিতির (Provincial conference-এর) অধিবেশন হয়। নাটোররাজ এই সমিতির অভ্যর্থনাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে ঠাকুর-পরিবারের সবাইকে নাটোরের রাজবাড়ীতে আহ্বান ক'রেছিলেন। "ঘরোয়া" প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, এই সময় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হ'য়েছিল যেমন চূড়ান্ত, আদর অভ্যর্থনাও তদনুরূপ। এখানে আশ্রমবাসীরাও একদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন। তিনি বালকদের খেলার জন্যে বল ইত্যাদি অনেক সামগ্রী পুরস্কার দিয়েছিলেন; এগুলি অনেকদিন আশ্রমের ভাণ্ডারে ছিল, দেখেছি।

ত্রিপুরার মহারাজ—মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য একবার আশ্রমে পদার্পণ ক'রেছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী দানশীল ছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কবির পরম সুহৃদ, পরম সহায় ছিলেন। কোন অনিবার্য্য কারণে তাঁর এখানে আসবার আগেই আমি বাড়ী গিয়েছিলাম, তাঁর অভ্যর্থনাদি ব্যাপার পরে শুনেছিলাম, মনে নাই। তবে তাঁর অভিনন্দনের অনুষ্ঠান কোন প্রকারে অঙ্গহীন হয়নি, এটা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

কুঞ্জলাল (?) ঘোষ—কুঞ্জবাবু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জামাতা। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে তিনি আশ্রমের কার্য্যে ব্রতী হন।

তিনি অধ্যাপনাও কত্তেন, অধ্যক্ষ সমিতির সম্পাদকও ছিলেন। প্রাক্‌-কুটীরের অনতিদূরে উত্তর দিকে কবির অনুমতিতে তাঁর বাসের জন্যে তিনি একটি বাসাবাড়ী প্রস্তুত করান, কিন্তু এই বাসায় বাস তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি; কোন কারণে তিনি অধ্যক্ষ সমিতির অসন্তোষভাজন হন। কথাটা কবির কর্ণগোচর হ'লে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শালবাগানের বাড়ীই তাঁর প্রথম এবং শেষ বাসা।

নগেন্দ্রনারায়ণ রায়—নগেনবাবু রামপুরহাটের হাইস্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। কুঞ্জবাবুর অবসরগ্রহণের পরে তিনি আশ্রমের অধ্যাপক হন। তিনি শান্ত-স্বভাব নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন; তাঁর রাগ ছিল না—যতদিন তিনি আশ্রমে ছিলেন, কোন দিনই তাঁর রাগ দেখিনি। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কত্তেন, রোগীর প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তাঁকে ডাকতে হ'তো না, একটু সংবাদ পেলেই তিনি রোগীর কাছে এসে উপস্থিত হ'তেন, ঔষধ দিতেন, সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা কত্তেন, কখনও বিরক্ত বা অসহিষ্ণু হ'তেন না। ক্ষত রোগীর ব্যাণ্ডেজ নিজেই বাঁধতেন। তাঁর অবসর গ্রহণের কারণ ঠিক মনে হয় না। "স্মৃতি"তে ৮৫ পৃষ্ঠায় কবি এঁরই বিষয় লিখেছেন, মনে হয়।

ছাত্রের আত্মাভিমান—"স্মৃতি"তে প্রকাশিত একখানি পত্রে কবি ছাত্রের আত্মাভিমানের বিষয় কিছু লিখেছেন। এই আত্মাভিমান—সকল বিষয়েই আপনাকে বড ক'রে দেখা, আপনার মতামতই ভাল মনে করা। এ বিষয়ে কবি দু'টি ছাত্রের কথা পত্রে লিখেছেন,—একটি শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, দ্বিতীয়টি শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ। সন্তোষের যে আত্মাভিমান ছিল, তার জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন, অধ্যাপককেও করুণাপূর্ব্বক এই মানসিক অস্বাস্থ্য সহ্য ক'রে সাগ্রহ ক্ষমার জন্যে অনুরোধ করেছেন; আর বলেছেন—সংসারে আঘাত-অভিঘাতে সে আপনিই এই বিকার হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে মানুষ হ'য়ে উঠবে।

রথীন্দ্রনাথের বিষয়ে তিনি লিখেছেন—"সৌভাগ্যক্রমেই রথীকে এই আত্মাভিমান আক্রমণ করে নাই—সে তাহার কোন পত্রে কখনো আভাষ-ইঙ্গিতেও নিজের গৌরব প্রকাশ করে নাই। এ সম্বন্ধে রথী তাহার পিতাকে জিতিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ আছে।"

রথীন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থা হ'তে বর্ত্তমানে সংসারিকের অবস্থা পর্য্যন্ত তাঁর স্বভাবগত বৃত্তির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে, কখনও তাঁর অভিমান দেখেছি ব'লে মনে হয় না। এটা কেবল আমার কথা নয়, অন্যের কাছেও তাঁর সবিনয় অমায়িক ব্যবহারের কথা শুনেছি।

একবার আমার একটি বৃদ্ধ আত্মীয় পৌষোৎসবে এখানে এসেছিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল, উৎসব দেখার সঙ্গে কবির দর্শনলাভও হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর কবি-দর্শনের আশা চরিতার্থ হয়নি, আমরা উত্তরায়ণে গিয়ে শুনলাম, কবি অনুপস্থিত, রথীন্দ্রনাথ বাড়ীতে ছিলেন, তাঁব সঙ্গে দেখা হ'লো। রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক বিনীত নমস্কারে বৃদ্ধের অভ্যর্থনা ক'রেছিলেন, সহজ মৃদু-মধুর কথায় শিষ্টালাপও কিছু হ'য়েছিল। রথীন্দ্রনাথের সদ্বংশের অনুরূপ অভ্যাগতের প্রতি এই নিরভিমান অভ্যর্থনা, সবিনয় শিষ্টাচার-সমুচিত-সদালাপ বৃদ্ধকে এরূপ মোহিত ক'বেছিল যে, পথে আসতে আসতে বার বার তিনি রথীন্দ্রনাথের আভিজাত্যের প্রশংসা ক'রেছিলেন, ব'লেছিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, দেশবিদেশ-বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের পুত্র আমার সঙ্গে যে এরূপ সামাজিকতা কর্ব্বেন, এ আমি ভাবতেই পারিনি। এইটেই বনেদি সদ্বংশের পরিচয়। বৃদ্ধ হ'য়েছি, এরূপ স্থলে এরূপ ব্যবহারে এরূপ আনন্দ আমার জীবনে এই প্রথম।

হীরালাল সেন—হীরালালবাবু আশ্রমে বালকদের বিষয়ে তত্ত্বাবধান ক'ত্তেন, অধ্যাপনার ভারও কিছু কিছু তাঁর উপরে ছিল। সে সময়ে স্বদেশীয় যুগের আরম্ভ। তিনি দেশে থেকেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ

দিয়েছিলেন, "হুঙ্কার" নামে একখানি উত্তেজনাপূর্ণ বইও লিখেছিলেন। বইখানি কবির নামে উৎসর্গ করা হ'য়েছিল, কবি তা জানতেন না; বই হস্তগত হ'লে জানতে পাল্লেন। "হুঙ্কার" প'ড়ে কবি গ্রন্থকারকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না, স্থির ধীর হ'য়ে দেশের কাজ করারই উপদেশ ছিল। সে পত্রের ভাষা মনে নেই। তবে যা দু' এক কথা শুনেছিলাম, তার ভাবটা এই রকমই মনে হয়,—ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। "হুঙ্কার" যথাকালে গভর্ণমেণ্টের কাণে পৌঁছুল। গ্রন্থকার বন্দী হ'লেন। "হুঙ্কার" আর বের হ'লো না, থামলো। কবির সেই পত্রখানি গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হ'য়েছিল; ফলে, খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্ট থেকে কবির আহ্বান এলো, নিরূপিত দিনে কবি কোর্টে উপস্থিত হ'লেন। সরকারী উকিল সেই পত্র দেখিয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন—এ পত্র কি আপনার লেখা? কবি স্বীকার ক'ল্লেন। গ্রন্থকারের ছয় মাস (?) কারাদণ্ড হ'লো। কবি এখানে এসে ব'ল্লেন, হীরালালের' কারাবাসের ব্যবস্থা ক'রে এলাম। মুক্তির পরে এখানে আসতে ব'লেছি। হীরালালবাবুর আশ্রমের আসার এই কারণ। এখানেও তিনি স্বভাব ছাড়তে পারেননি, মাঝে মাঝে তাঁর ছোট-খাটো হুঙ্কার শোনা যেত—কাজ নিয়ে শিক্ষক কর্ম্মচারীর সঙ্গে প্রায়ই খটমটি বাধতো, সময়ে সময়ে একটু গুরুতর ভাবও ধারণ ক'ত্তো। শেষে অবসরগ্রহণে বিরোধের অবসান হ'লো।

কবির প্রাতরুত্থান—বার মাসই ঊষাকালেই কবির শয্যাত্যাগের অভ্যাস ছিল। একটু অন্ধকার থাকতেই তিনি উঠে বাইরে এসে পূর্ব্বমুখে ব'সতেন। বোধ হয় এইটা তাঁর উপাসনার সময় ছিল। "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"-এ দেখা যায়, সন্ধ্যার পরও তিনি বাইরের বারান্দায় গিয়ে ব'সতেন, তন্ময় হ'য়ে কি যেন ভাবতেন। তিনি ব'লেছেন, —"আজকাল এমন হ'য়েছে একটা জিনিস খুঁজছি, অথচ খুঁজে পাইনে।

কিসের যে সন্ধান ক'রি জানিনে, কেন যে সন্ধান ক'রি তাও জানিনে। কেবল জানি, সন্ধানে আছি। এ খানিকটা ঠিক মাছধরার মতো। মাছ ধ'রছি—কিন্তু কোন্ মাছ উঠবে ছিপে, তা জানা নেই।"

আমার বোধ হয়, এটা তাঁর ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্মবিদ্যা-লাভেরই কথা।

কবির সামাজিকতা, সদাচরণ, আত্মীয়ভাব—অধ্যাপক, ছাত্র, অভ্যাগত—সকলকেই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ করার সামর্থ্য কবির অসাধারণ ছিল। আশ্রমে অথবা অন্যত্র যথনই তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁর হ'য়েছে, তিনিই তাঁর শিষ্টাচারে, আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহারে, স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, চিত্তাকর্ষক বাক্যবিন্যাসে মুগ্ধ হ'য়ে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁকে গ্রহণ ক'রেছেন। তাই সর্ব্বত্র তাঁর মৈত্রী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোথাও তাঁর বন্ধুজনের অভাব ছিল না।

আমি যেদিন প্রথমে আশ্রমে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছিলাম, তখন তিনি শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে ছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি নীচে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমাধ্যক্ষের কাছে এসেছিলেন। এরূপ স্থলে অন্য কোন প্রভু হ'লে খুব সম্ভব, এটা তাঁর সম্মানের হানি-জনক মনে ক'রে ভৃত্য বা কর্ম্মচারীর উপরেই এ ভার দিয়ে তিনি কর্ত্তব্য শেষ মনে কত্তেন। প্রভু রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে সে অসামাজিকতার ভাবের স্থান ছিল না। তাই আমি সামান্য হ'লেও, কর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠানে সে বিচার তাঁর মনেই আসে নি, তিনি নিজেই সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। তাঁর প্রতি আমার পূর্ব্ব গুণপক্ষপাত এই অনন্যসাধারণ ব্যবহারে আরও দৃঢ় হ'লো।

কয়েকমাস পরে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন,—আশ্রম তোমার কেমন লাগছে? তুমি এখানে থাকতে চাও, না, তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মস্থান পতিসরে যাবে। আমি অভিমত স্থানে অভিমত বিষয়ই পেয়েছিলাম। তাঁকে বিনীতভাবে ব'ল্লাম—আমি এখানেই থাকবো।

আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম। তিনি প্রীত হ'লেন, ব'ল্লেন—আচ্ছা, এখানেই থাকো। এখন বার্দ্ধক্যেও আমার সেই থাকাই চ'লছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি সংস্কৃতের অধ্যাপক বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকের পদে নিয়োগার্থ কবির নিকটে প্রার্থনা ক'রেছিলেন। কবির অনুমতিতে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় অধ্যাপককে লিখেছিলেন, —ন্যূনকল্পে তাঁর পরিবারবর্গের মাসিক ব্যয় কত। উত্তরে মাসিক ব্যয় জেনে কবির আদেশানুসারে ব্যয়ানুরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করে' অধ্যাপক মহাশয়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হ'য়েছিল। কর্ম্মিনিয়োগ বিষয়ে প্রার্থীর সংসারিক ব্যয়ানুসারে বৃত্তির ব্যবস্থা আমি আর দেখেছি বলে' মনে হয়না।

"স্মৃতি"তে প্রকাশিত কবির পত্রপুঞ্জের মধ্যে অনেক পত্রে তাঁর সামাজিকতা, সদাচরণ ও আত্মীয়ভাবের পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির শয়নগৃহ—শান্তিনিকেতনের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে যে নূতনবাড়ী—আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে এইটি কবির প্রথম বাসগৃহ। এর পূর্ব্বে যে "দেহলী", তার প্রথম অবস্থা একতলা একটি কুটিরমাত্র। আশ্রমে কবির এই প্রথম স্বকৃত শয়নগৃহ, পরে দেহলীর দোতলায়ও তিনি কিছুদিন বাস ক'রেছিলেন। তখন এর চারদিক বিশেষতঃ পূর্ব্বদিক বহুদূর পর্য্যন্ত মুক্ত আকাশ—যেন সূর্য্যোদয় শয়নকক্ষ হ'তেই কবির দৃষ্টিগোচর হয়। শয়নকক্ষের সকল দিক্, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিক্ কবি এইজন্যেই সর্ব্বদা মুক্ত রাখতেন।

উত্তরায়ণে কোনার্কেরও প্রথম পত্তন—একটিমাত্র কুটির—তখন এরও চারিদিক্ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিক্ পরিশূন্য আকাশ। কবির পরিবর্ত্তন-প্রিয় স্বভাবে "দেহলীর" প্রথম কুটিরদ্বয় এখন বর্ত্তমান দেহে দেহলী নাম ধারণ ক'রেছে। কোণার্কেরও মূলীভূত সেই কুটিরটি এখন নেই, সেই বাস্তুতে কক্ষ-সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে বর্ত্তমান "কোণার্ক" এখন প্রতিষ্ঠা-

লাভ করেছে। এখন উভয়েরই প্রথম অবস্থা বিশেষভাবে ভেবেই মনে কত্তে হয়।

শুনেছিলাম, কোণার্কেরও সেই প্রথম কুটিরের পূবের দিকে একটা স্নানের ঘর করার কথা হ'য়েছিল। পূর্ব্বদিকের দৃশ্যের অন্তরায় হ'বে বলেই কবি তখন তাতে সম্মতি দেননি, পরে সে দিকে অন্য কক্ষ হ'য়েছিল।

"শ্যামলী"র দেয়াল উঠবার আগেই পশ্চিমদিকের বাধাস্বরূপ "মৃন্ময়ী" বাড়ী ভেঙে ফেলা হ'য়েছিল। পূর্ব্বদিকের অন্তরায় দু'একটা মহানিম গাছও কাটা পড়েছিল। সূর্য্যোদয়ের ন্যায় সূর্য্যাস্তও যে কবির প্রীতি-জনক দৃশ্য ছিল, ইহা তাহাই সপ্রমাণ করে।

"রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে"র পরিশিষ্ট

[১৩৪৮ সালের 'দেশে'র শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের "রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ" নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথ (আমাদের 'ভূপেনদা') ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আমার প্রায় এক বৎসর পরে ১৩১০ সালে অগ্রহায়ণে (?) আশ্রমের কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, প্রণয়প্রবণ হৃদয়, অমায়িক ব্যবহার অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে আমাদের সকলেরই প্রীতিভাজন করিয়াছিল। তখন শিক্ষক ও ছাত্রদিগের বাসস্থান একটি মাত্র গৃহ; ইহা আদি বলিয়া এখন ইহার নাম "প্রাক্ কুটীর"। এই কুটীরের পশ্চিমাংশে আমার বাসস্থান ছিল, ভূপেনদাও এই স্থানে থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার সাহচর্যলাভে কোন বাধাই ছিল না। সর্বদা একত্র বাসে অল্পকালেই তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ একটু প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেটা তাঁহারই চরিত্রমহত্ত্ব। অবসর পাইলেই দুইজন একত্র বসিয়া আশ্রমাদি নানা বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা চলিত। তিনি যতদিন আশ্রমে ছিলেন, বিদ্যালয়ের কার্য্যভার প্রধানভাবে তাঁহারই উপরে ন্যস্ত ছিল। সাহচর্য্য হেতু তাঁহার অধিকারের অনেক বিষয় আমার জানার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, তিনি আমার অজ্ঞাত অনেক বিষয় আমাকে বলিতে দ্বৈধবোধ করিতেন না। এই হেতু তাঁহার লিখিত এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির ঘটনাসমূহ বিশেষ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত

পড়িয়াছি। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'এখন আর সব কথা মনে নাই'; কথাটা ঠিক। আমার পক্ষে সেই একই কথা। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয় আমিও ভুলিয়াছিলাম, প্রবন্ধ পড়িয়া তাহা জানিতে পারিলাম। তিনি প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে ও কবির বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা নিঃশেষ হয় নাই, তত্তদ্‌বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাই তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপ এই প্রবন্ধ।]

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়—সতীশচন্দ্র রায় (সতীশ বাবু) ভূপেন-দার আগেই, ১৩১০ সালে গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যেই আশ্রমের অধ্যাপনা-কার্য্যে যোগদান করেন। সতীশ বাবুর মুখ তাঁহার সরল মনের দর্পণস্বরূপ ছিল, দেখামাত্রই প্রফুল্ল মুখে প্রতিভাত অমায়িকভাব বুঝা যাইত। অধ্যাপক ছাত্র—সকলেরই সঙ্গে তাঁহার মিশিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখিযাছি। শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া তিনি অধ্যাপনায় কথোপকথনে গল্পে বালকদিগের সহিত বেশ মিশিয়া যাইতেন। বাংলা সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার গদ্যপদ্য-প্রবন্ধে লেখার শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গুণে তিনি কবির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরাও তাঁহাকে বিশেষ বন্ধুভাবে পাইয়াছিলাম। মাঘোৎসবের পূর্বে তিনি দিনুবাবুর (দিনেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের) সহিত পশ্চিমে বেড়াইতে যান। সতীশবাবু পশ্চিম হইতে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। দিনু বাবু যোড়াসাঁকোর বাটীতে গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আশ্রমে অধ্যক্ষের কার্য্যে ছিলেন। তিনি সতীশবাবুর চিকিৎসার সেবাশুশ্রূষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সতীশবাবুর

প্রাণরক্ষা সাধ্যাতীত হইল—বসন্তের সাংঘাতিক আক্রমণ তাঁহার জীবিতকাল নিঃশেষ করিল। কবি এই সময়ে শিলাইদহের কুঠীবাড়ীতে আশ্রমের কার্যপরিচালনার ব্যবস্থা করেন। ভূপেন-দা প্রবন্ধে ইহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ছাত্রগণের প্রাতঃস্নান—ভূপেন-দা ছাত্রদিগের প্রাতঃস্নানের কথা লিখিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার আসার পূর্বে সকলেরই প্রাতঃস্নানের নিয়ম ছিল, বিশেষ কারণে বিশেষ বিধিও ছিল। আশ্রমের দক্ষিণে যে সুদীর্ঘ বাঁধ আছে, তখন তাহার তলদেশ বালুকাময়, জল সুগভীর, সুনির্ম্মল ছিল। এই বাঁধেই বালকদিগের প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একজন অধ্যাপক বালকদিগের নায়ক থাকিতেন, স্নানের সময়ে তিনি ছাত্রদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই সময়ে সন্তরণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কি না, আমার স্মরণ নাই; সে প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্বের কথা। স্নানের পরে পট্টবস্ত্রে পট্ট-উত্তরীয়ে ব্রহ্মচারিবেশে পৃথক আসনে বৃক্ষতলে বা অন্য নিভৃত স্থানে বালকগণের উপাসনার নিয়ম ছিল; সমবেত উপাসনায় উপনিষদের শ্লোকপাঠ ছিল কি না, ঠিক মনে হয় না। বিশ্বভারতীতে এই নিয়ম এখনও অব্যভিচারে চলিয়া আসিতেছে। আশ্রমে স্নানেব ব্যবস্থা ভূপেন-দা দেখিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতা বা ম্যানেজারী—অমায়িক স্বভাব, সরল ব্যবহার ও শিষ্টাচারের জন্য ভূপেন-দা কবির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কবি যখন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার ভূপেন-দাকে দিবেন স্থির করিয়া তাঁহার নিকটে এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই পদের নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয় হইতে তিনি মুক্তি পান নাই, আশ্রমের কার্য্যভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল—তিনিই ম্যানেজার হইয়াছিলেন। কোষরক্ষায় ও হিসাব-পত্রে যোগ্যতার অভাব বলিয়া

তিনি যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই। তিনি হিসাবের খরচ লিখিতে কখন কখন ভুলিতেন, শেষে গচ্চা দিয়া হিসাব ঠিক করিতেন। কোষরক্ষায় তাঁহার অসাবধানতার পরিচায়ক একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। একদিন তিনি লোহার সিন্ধুক হইতে টাকা বাহির করিয়া থোকে থোকে সাজাইয়া মজুত টাকার হিসাব মিলাইতেছিলেন; এই সময়ে কোন কার্যোপলক্ষ্যে তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হইল, ত্বরান্বিত হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন, টাকা তুলিয়া সিন্ধুকে রাখার কথা মনে হইল না, সবই সেইরূপ অরক্ষিত অবস্থায়ই রহিল। এই সময়ে একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সে তাঁহার ঘরের দরজায় পা দিয়াই দেখিতে পাইল, সিন্ধুক উন্মুক্ত, টাকা থোকে থোকে সাজান, ম্যানেজারবাবু অনুপস্থিত। ভূপেন-দার ভোলা স্বভাব সে ভালই জানিত, ভাবিল ম্যানেজারবাবু নিশ্চয়ই ভুলিয়া এইরূপ করিয়াছেন, সে সেই দরজায়ই দাঁড়াইয়া রহিল, মনে করিল, অন্য চাকর এ লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না, ম্যানেজারবাবু বিপন্ন হইবেন। ভূপেন-দার এ বিষয় সংশয় হওয়া দূরে থাক, এ কথা তাঁহার মনেই স্থান পায় নাই। তিনি নিঃসংশয় নিরুদ্বেগচিত্তে কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিলেন, দেখিলেন দ্বারে ভৃত্য দণ্ডায়মান। বাহিরে থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে, তুই এখানে কেন? ভৃত্য বলিল,—আমার কাজ আছে; আমি এখানে এসে দেখলাম, আপনার সিন্ধুক খোলা, টাকার থোকা সাজান, এখান থেকে এক পাও নড়ি নি, দাঁড়িয়েই আছি, পাছে আর কোন চাকর ঘরে ঢোকে। থোকা গুণে দেখুন, টাকা ঠিক আছে কি না, তার পরে ঘরে ঢুকব, আমার কথা ব'লব। ভৃত্যের এইরূপ কথায় ভূপেন-দা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, শশব্যস্তে ঘরে গিয়া টাকার থোকা গুনিয়া দেখিলেন, টাকা ঠিকই আছে। ভৃত্য তখন নিকটে আসিল। সাধারণ ভৃত্যের এইরূপ বিশ্বস্তের আচরণ দেখিয়া

তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এই ভৃত্য তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিরস্কারাদিও তাহার ভাগ্যে ঘটিত, ভূপেন-দা পরে অনুতপ্ত হইয়া বেচারাকে পুরস্কারও দিতেন। সে বলিত, —ম্যানেজারবাবু ব'কলে শাসা'লে ভাল, আমার কিছু লাভ হয়। একশত টাকার নোটের পরিবর্ত্তে ভ্রমে হাজার টাকার নোট কবিকে দেওয়ার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—কবির মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সত্যবাবু) কয়েক বৎসর পরে বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ দীর্ঘসুগঠিতদেহ মৃদুস্বল্পভাষী একরূপ উদাসীন যুবা। কিছু গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও, সকলের সহিত তাঁহার বেশ মেশামিশি ছিল, আমোদপ্রমোদে যোগ দিয়া তিনি তাহা বেশ উপভোগ করিতেন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা শিক্ষকের আদর্শস্থানীয় ছিল। শান্তিনিকেতনে বর্ষার দৃশ্য বড মনোহর। দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরেব মধ্যে শালতালমধূকাদির শ্যামলপত্রসম্পদে শ্যামায়মান শান্তিনিকেতন মারবদ্বীপের মতই বোধ হইত। কালবৈশাখীর দিনে, বর্ষার সমাগমে অবিরল ঝর-ঝর বৃষ্টিধারাপাত মাথায় লইয়া শিক্ষকেরা বালকগণের সহিত এই দিগন্ত প্রান্তরে মাতামাতি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বর্ষণের সুখ উপভোগ করিতেন। ঠিক মনে নাই, সত্যবাবুও বোধ হয়, ইহাতে যোগ দিতেন। একদিন বর্ষাকালে ভাদ্র মাসে (?) অবিরল ধারাপাত হইতেছে, ছাত্রাবাসের কিছু দূরে একটি নিভৃত কুটীরে আমরা কয়েকজন শিক্ষক বসিয়া আছি। নানা প্রকার তৎকালোচিত আষাঢে গল্প চলিতেছে। হঠাৎ বর্ষার গানের খেয়াল উঠিল, কে কে উপস্থিত ছিলেন, কে প্রথম গান ধরিলেন, ঠিক মনে নাই, তবে সত্যবাবু, ভুপেন-দা সে দলে ছিলেন, ইহা ঠিক। "এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর"—বিদ্যাপতির এই বর্ষাবর্ণনার গান আরম্ভ হইল। সকলেই

স্থিরভাবে নিবিষ্টচিত্তে সঙ্গীত উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু, "কুলিশ শত শত, পাত-মোদিত, ময়ূর নাচত মাতিয়া"—এই পদ গানের সময়ে ময়ূরের নাচে সত্যবাবুর মন নাচিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিলেন, এক পা তুলিয়া এক পায়ে ভর দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন, নৃত্য দেখিয়া সকলে হাসিয়া কুটপাট। গানটার আমোদ এইরূপে সকলেরই বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

সত্যবাবু ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঔষধে রোগ ভাল হয় না, উপবাসই রোগেব পরম ঔষধ, উপবাসেই অপ্রকৃতিস্থ শরীর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া রোগমুক্ত হয়। সেইজন্য তিনি রোগে ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, উপবাস করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন।

বালকদিগের স্বাস্থ্য, অধ্যাপনা ও শিষ্টাচার—ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের বিষয় কবি যেমন অবহিত ছিলেন, তাহাদের অধ্যাপনার সুশৃঙ্খলবিধানেও তাঁহার তদ্রূপই সাবধানতা ছিল। আমার "গুণস্মৃতি" প্রবন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষায় কবির সাবধানতার বিষয়ে ঘটনাবিশেষের উল্লেখ আছে, এখানে তাহাব পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ভূপেন-দার প্রবন্ধে জগদানন্দ রায় মহাশয়ের ঘটনা অন্যতর উদাহরণ। অধ্যাপক নিযুক্ত কবিয়া কবি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। অজ্ঞাতভাবে তাঁহার অধ্যাপনার পদ্ধতি পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের ও অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রের আচরণও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির বিষয় ছিল। আমি ইহা জানিতাম না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম—ইহা কোন অধ্যাপকবন্ধু আমাকে পরে বলিয়াছিলেন।

১৩১৮ সালে কোন কারণে বিদ্যালয়ের কায্য হইতে আমাকে অবসর লইতে হইয়াছিল। এই সময় যিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অধ্যাপনাব পরীক্ষায় তিনি কবির মনস্তুষ্টি করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, শীঘ্রই তাঁহাকে অবসর লইতে হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি

আমাকে আবার আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধে ইহার বিবৃতি আছে।

কোনও কারণে ছাত্রের পীড়ন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিরক্তিকর ছিল। একবার কোন অধ্যাপক তাঁহার ব্যক্তিগত কোন কারণে কুপিত হইয়া একটি ছাত্রকে প্রহার করিয়াছিলেন—প্রহার একটু গুরুতরই হইয়াছিল। এই কথা কবির কর্ণগোচর হওয়ামাত্র অধ্যাপককে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার আদেশ দিয়াছিলেন।

মৃদুস্বরে অধ্যাপনার পক্ষপাতিত্ব কবির ছিল না। তিনি বলিতেন, তাদৃশ পাঠনায় বালকগণের মনোনিবেশ সতর্ক ও পাঠাভিমুখ থাকে না, মন অলস হইয়া পড়ে, উচ্চস্বরে পাঠনায় মনোযোগ পাঠ্যের অভিমুখ ও সক্রিয় থাকে, আলস্য শৈথিল্যের অবসর থাকে না।

পাঠের সময়ে ছাত্রেরা শিক্ষককে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিবে—ইহা তিনি শিক্ষকদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন, শিক্ষকেরাও তদনুসারে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বালকেরা প্রথম প্রথম কয়েক দিন কবিব আদেশ পালন করিত, পরে তদ্বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক শৈথিল্য দেখা যাইত, শিক্ষকেরাও অনিচ্ছাসত্ত্বে বলপূর্ব্বক সম্মান আদায় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি যে যে দেশে গিয়েছি লক্ষ্য করেছি, সে সকল স্থানেই পূজ্যের প্রতি পূজা-প্রদর্শনের যে কোন একটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহা তদ্দেশীয়েরা অকৃপণভাবে প্রতিপালন করেছেন। আমরা এ বিষয় অতি কৃপণ, সহজে এ সম্মান মাননীয়কে দিতে চাই না, এটা আমাদের পরম দুর্বলতা, চরম অসভ্যতা।"

দরিদ্রভাণ্ডার, সাঁওতাল-পাঠশালা—ভূপেন-দার সহিত পরামর্শ করিয়া দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ আশ্রমে একটি দরিদ্রভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলাম। ইহা রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট বিষয়ের অন্যতম। শিক্ষক-দিগের প্রদত্ত মাসিক চাঁদায়, অতিথি-অভ্যাগতের দানে, কবির সাময়িক অর্থসাহায্যে এই ভাণ্ডার অল্পদিনেই বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পাকশালায় প্রত্যহ যে চাউল আসিত, তাহা হইতে দুই সের চাউল ভাণ্ডারেব জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মন্দিরের ফটকে লৌহ কপাটে ভাণ্ডারের একটি ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন ছিল, তাহার উপরে লিখিত ছিল,—"সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগ-ধর্ম্ম সার ভুবনে।" মন্দিরের দর্শকগণ ও পর্ববিশেষে সমাগত মহাত্মারা এই পাত্রে কিছু কিছু দান করিতেন। ইহাতেও ভাণ্ডারের কিছু ধনোপচয় হইত। বিদ্যালয়ের চাউল হইতে দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইত, উদ্বৃত্ত অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভাণ্ডারের হিসাবে জমা হইত। সংগৃহীত অর্থের হিসাবপত্র আমিই রাখিতাম। এই অর্থে কাপড, চাদর, কম্বল কিনিয়া দরিদ্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দরিদ্র ছাত্রের বেতন, পুস্তকের মূল্য, দুঃস্থদিগের সাহায্যার্থ অর্থ, বিদেশীয় অর্থহীন বিপন্ন ভদ্রলোকের পাথেয় ইত্যাদি এই ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইত। অধ্যাপক শরৎকুমার রায় মহাশয় সময় সময় ছাত্রদিগের নিকট হইতে পরিত্যক্ত কাপড, জামা, চাদর, মশারি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে পাঠাইতেন। এইরূপ সমবেত চেষ্টায় ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধভাবে চলিয়াছিল। শেষে দরিদ্রবন্ধু মহাত্মা পিয়ার্সন্ এই ভাণ্ডারেব কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। তখন আমাদের দুইজনের পরামর্শে ভাণ্ডারের কার্য্য চলিত। সাঁওতালপল্লীতে সাঁওতাল বালকদিগের শিক্ষার্থে পিয়ার্সন্ যে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অধিকাংশ সময়ই থাকিতেন। সাঁওতাল বালকদিগকে লইয়া এইখানেই একত্র ভোজন করিতেন। তাঁহার দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও সহৃদয়তার ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অমায়িক স্বভাব সকল সাঁওতাল পল্লীবাসীকে তাঁহার অনুরক্ত বন্ধু করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু দরিদ্রের সহচর মহাত্মা

পিয়ার্স‌ন্ দুর্ভাগ্যের প্রতিকূলতায় অকালেই পরলোকগত হইলেন, দরিদ্র বন্ধুর দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির নিদারুণ অবসান হইল।

বন্ধুগণের সাহায্যে জন্ম হইতেই দরিদ্রভাণ্ডারকে লালিত পালিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া শেষে কার্য্যবাহুল্যে সময়াভাবে ভাণ্ডারের কার্য্যভার, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভূপেন-দার সময়ে ভাণ্ডারের ঈদৃশ সমৃদ্ধি হয় নাই, তাই তাঁহার প্রবন্ধে ইহার উল্লেখমাত্র আছে, বিবৃতি নাই।

প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন—প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, ইহা কবির অভিমত বিষযের অন্যতম। ছাত্রেরা স্বহস্তে মাটি চষিয়া-খুড়িয়া পা'ট করিয়া সারি সারি বৃক্ষ রোপণ করিবে, পশুর কবল হইতে সাবধানে তাহাকে রক্ষা করিবে, দরদী হইয়া জল দিয়া পরিপালিত পরিবর্দ্ধিত করিবে এবং সেই শিশু বৃক্ষকে ক্রমপরিণত তরুবরের ফলফুলে সুশোভিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে উৎসাহের সহিত অন্য বৃক্ষ রোপণ পালন করিবে—ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। একদিন তিনি সমবেত ছাত্রশিক্ষকমণ্ডলীতে তাঁহার এই অভিমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এই বিষয়ে সকলেরই মনোযোগের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কবির এ আশা ফলবতী হয় নাই, তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'বৃক্ষরোপণ' উৎসবেই তাঁহাকে এই আশার পরিতৃপ্তি করিতে হইয়াছিল।

অপরাধীর প্রতি কবির ব্যবহার—দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া দোষীকে কর্কশ কথায় তিরস্কার করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ছিল না। অনেক স্থলে স্বাভাবিক সঙ্কোচবোধ হেতু তিনি নীরবে অপরাধ সহ্য করিতেন, কোন কোন স্থলে, আবশ্যক হইলে, তিনি স্বভাবমধুর মৃদু কথায় দোষের বিষয় এমনভাবে বলিতেন, যেন দোষী মর্ম্মাহত না হন। আমার "গুণস্মৃতি" প্রবন্ধে এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে

দোষোল্লেখে তাঁহার প্রকৃতিগত সঙ্কোচবোধের উদাহরণরূপে আমার ব্যক্তিগত একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ভূপেন-দার ম্যানেজারীর সময়ে সকালে বিকালে রাত্রিতে বালকদিগের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণের ভার কিছুকাল আমার উপরে ছিল। কোন কারণে মধ্যাহ্নে বালকদিগের আসার পূর্বে আমার আসা সম্ভব হইত না, সেই সময়ে আমার এক অধ্যাপকবন্ধু আমার পরিবর্ত্তে আসিয়া খাওয়ার প্রথম ব্যবস্থা করিতেন, আমি কিছু পরেই যোগ দিতে আসিতাম। এই সময়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুই শত। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের খাওয়ার পরে আমরা খাইতাম। একদিন সকলের খাওয়ার পরে শুনিলাম, একটি অস্পৃশ্য জাতির বালকের কোনপ্রকার সংস্পর্শে অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন দূষিত হইয়াছে। ঠাকুর চাকরেরা আপত্তি করিয়া বলিল, আমাদের কি ব্যবস্থা হইবে? আমি বলিলাম, কর্ত্তৃপক্ষকে জানাও, তাঁহারা ব্যবস্থা করিবেন। আমরা দুগ্ধাদি খাইয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া স্বস্থানে আসিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, স্মরণ হয় না।

এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে মহর্ষির সরকারে খাজাঞ্চি আমার বড়দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কোন কার্য্যোপলক্ষে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—তোমার নামে কিছু অভিযোগ শুনিলাম। যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বাবুরা বলিলেন,—যদু, তোমার ভাইএর কথা শুনেছ? তোমার ভাই বিদ্যালয়ের অনেক ভাত নষ্ট করেছে। বড়দাদার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সেই সংস্পর্শ-দূষিত ভাতের কথা আমার মনে হইল। বড়-দাদাকে তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া বলিলাম,—কবি ইহা নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমিও তাঁর অপ্রিয়ভাজন হয়েছি। বড়দাদা বলিলেন,—এ সব কথা তাঁর বড় মনে থাকে না, ভুলেই যান। এই কথায়

আমি আর তখন ইহার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না, কিন্তু মনে অশান্তির বেদনা রহিয়া গেল। কিছুকাল পরে আমিও ইহা ভুলিয়া গেলাম। কবি তখন শান্তিনিকেতনে অতিথিশালার দ্বিতলে থাকিতেন। রান্নাঘরের কার্য্যসংক্রান্ত কোন একটা বিষয় বলিবার জন্য আমি তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। আমার কার্য্য শেষ হইলে, হঠাৎ আমার ঐ নষ্ট-করা ভাতের কথা মনে হইল, আমি নিবেদন করিলাম,—আমার আর একটি বক্তব্য আছে। কবি বলিলেন,—বল। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—বিদ্যালয়ের ভাত নষ্ট করার কথা আপনি কি শুনেছেন? তিনি উত্তর করিলেন,—হঁা শুনেছি, তুমি চল্লিশ বিয়াল্লিশ জনের ভাত নষ্ট করেছ। আমি শুনিয়াই চমকিত হইলাম, বলিলাম,—পূর্বেই শিক্ষক ছাত্রদের খাওয়া হয়েছিল, আমরা দু-তিন জন শিক্ষক আর ঠাকুর চাকর এই কয়েকজনমাত্র অবশিষ্ট ছিলাম। এতে এত লোকের ভাত নষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, কথাটি অতিরঞ্জিত হ'য়েই আপনার কাণে উঠেছে। এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনা যথাযথ তাঁহাকে শুনাইলাম। কবি তখন বলিলেন,—এখন সব বুঝলাম। আমি বলিলাম,—এর জন্য আমার উপর আপনার বিশেষ অসন্তোষ ছিল। কবি স্বীকার করিলেন। তখন বলিলাম,—এর পরে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা আপনি শুনলে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন, দোষ থাকলে স্পষ্টই স্বীকার ক'রবো, একটুও .অন্যথা ক'ববো না, সমুচিত দণ্ডের জন্যও প্রস্তুত থাকবো। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কবির ক্ষমা—আমার "গুণস্মৃতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কবির দয়াপ্রবণতা—আশ্রমে আসার কিছুকাল পরে আমার ছোট ভাই উন্মাদগ্রস্ত হয়। কবি তখন আশ্রমে ছিলেন। তাঁহাকে ইহা জানাইয়া ছুটির জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বাড়ীতে আর কে কে আছেন? আমি বলিলাম,—পুরুষ

কেহই নাই, মেয়েরাই আছেন। কবি বলিলেন,—তোমার ভাইকে এখানে আন, আমি তার সঙ্গে একজন চাকর রেখে দেব, সে দেখবে, তুমি নিরুদ্বেগে থাকতে পারবে। মহাত্মার আমার প্রতি এইরূপ অপ্রত্যাশিত সহানুভূতির সহিত দয়ার কথায় আমার চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল, ভাব সংযত করিয়া নিবেদন করিলাম,—দেশে সেবাশুশ্রূষার লোক, পথ্যদ্রব্য সহজলভ্য, এখানে তার সম্পূর্ণ অভাব, এতে আপনাকেই অকারণে পীড়িত করা হবে মাত্র। তিনি কথাটা বুঝিলেন, বলিলেন,— আচ্ছা, তবে যাও। আমার মত নগণ্যের প্রতি তাঁহার এই সদয় ব্যবহার আমরণ আমার স্মরণীয় বিষয়।

ধর্ম্মে কবির পক্ষপাতহীনতা—ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্র প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ভূপেন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রী (এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী) প্রভৃতি অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি হিন্দু মতানুসারে আশ্রমের পাকশালায় পাচকব্রাহ্মণ, নবশাক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সহভোজন তাঁহার অনভিমত না হইলেও, তিনি পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাহাকে প্রাধান্য দেন নাই। সকলেই যথারুচি ভোজন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার সর্ববাদিসম্মত মত ছিল। কোন কোন অভিভাবক একবার আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কবির এই যথারুচি ভোজনের মত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধী যখন পাকশালায় ঠাকুর চাকরের প্রচলন রহিত করিয়া সর্ববর্ণসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে অনুপস্থিত। এইরূপ আকস্মিক আচারবিপ্লবে বিশৃঙ্খলার বিষম আঘাতে আশ্রমেব চির-প্রচলিত নিয়ম ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, উদ্বেগ-অশান্তিতে সকলেরই মনও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিয়ম কিছুদিন চলিলে, কবি

আশ্রমে আসিয়া গোল মিটাইয়া পুনর্বার পূর্ব নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।

কবির সংক্রামক রোগে সাবধানতা—রবীন্দ্রনাথ সংক্রামক রোগে সর্বদা সাবধান ছিলেন। এ সাবধানতা কেবল তাঁহার নিজের বিষয়েই নহে, আশ্রমবাসী সকলেরই পক্ষে তাঁহার সাবধানতার লেশমাত্রও ত্রুটি ছিল না। একবার কোন অধ্যাপকের পুত্র বসন্তরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াই আশ্রমে আসিয়াছিল। এই সংবাদ কবির কর্ণগোচর হইলেই তিনি সেই অধ্যাপকের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ঘরে আর যাঁহারা ছিলেন, ব্যবস্থা করিয়া তখনই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলেন।

ইহার পরে এক সময়ে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া, কবিকে স্বপরিবারে আমার বাসায় খাওয়ার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। সেই সময়ে 'উত্তরায়ণ' পরিবারস্থ একটি বালিকার হাম হয়, কবির বধূমাতা তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আমার বাসায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতাকে আসিতে দেন নাই, বলিয়াছিলেন,—তাব বাসায় বালকবালিকারা আছে, তাদের জন্য আমার শঙ্কা হয়।

মানব প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে কবির নিপুণতা—লোকচরিত্রপরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল। অধ্যাপকদিগের চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনা তাঁহার এই শক্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

ভূপেন্দ্রনাথ ন্যায়নিষ্ঠ ম্যানেজার ছিলেন। বিদ্যালয়ের হিতকল্পে যাহা তিনি ন্যায্য বলিয়া স্থির করিতেন, শতবাধাসত্ত্বেও পক্ষাপক্ষনির্বিশেষে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন, ইহাতে কাহারও ভবিষ্যৎ প্রিয়াপ্রিয়তার বিচারণা তাঁহার ছিল না; এই হেতু আশ্রমের কোন কোন শিক্ষকের তিনি বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। একবার কবি কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে

ভূপেন-দাকে শিলাইদহে আহ্বান করেন, তিনিও তদনুসারে কবির নিকটে উপস্থিত হন। ঠিক এই সময়েই কোন কোন অধ্যাপক তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিয়া কবির নিকটে অভিযোগপত্র পাঠাইয়া দেন। সেই পত্র যখন রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হয়, তখন ভূপেন-দা কবির নিকটেই ছিলেন। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ কবি অভিযোগপত্র পড়িয়াই সব বুঝিলেন, বিচলিত হইলেন না; কিছু না বলিয়াই পত্রখানি ভূপেন-দার হাতে দিলেন। ভূপেন-দা পত্র পড়িয়া অপ্রত্যাশিত তাদৃশ অভিযোগে বিষণ্ণ হইলেন দেখিয়া, কবি স্বভাবমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে বলিলেন,—দুঃখিত হবেন না, আমার এ কথায় আস্থা নাই। আপনি যে কাজের ভার নিয়েছেন, তা ন্যায্যভাবে কর্ত্তে হ'লে সকলেরই মনোরঞ্জন করা অসম্ভব। এ কাজে তিরস্কার-পুরস্কার দুইই আছে। আমি জানি আপনি ন্যায়নিষ্ঠ, তাই আপনাকেই এ কাজের ভার দেওয়ার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কবির এই কথায় ভূপেন-দা বলিলেন,—পত্র পড়ে' দুঃখিত হই নি, এ কথা আমি ব'লতে পারি না—সেটা সত্যের অপলাপ। সাবধানে যথাশক্তি কাজ করে'ও অভিযোগের কারণ হ'ব, এটা আমি ভাবি নি; সকলকেই সন্তুষ্ট করে' কাজ করার চেষ্টাব ত্রুটি করি নি, তবে কেন অকৃতকার্য্য হ'য়েছি, জানি না। এ ক্ষেত্রে এ অভিযোগে আপনার আস্থা নাই, এইটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়।

ভূপেন-দা আশ্রমে ফিরিয়া আমাকেই এ ঘটনা বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ নাই, আমি ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভূপেন-দার আসার পূর্বে শ্রীযুত দ্বিপেন্দ্রনাথ কিছুকাল বিদ্যালয়ের অর্থসচিব ছিলেন। তিনিও এইরূপ অভিযোগে বিরক্ত হইয়া শেষে সচিবপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন কথাপ্রসঙ্গে এ কথা আমি তাঁহার নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কবির প্রতিভায় অন্যের বিদ্বেষ-বুদ্ধি—পূর্ব হইতেই কবির প্রতিভাজন্য খ্যাতিতে অন্যের বিদ্বেষ-বুদ্ধির অভাব ছিল না। কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবিই এই বিপক্ষতাচরণ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, ইহা মনে হয় না। প্রতিভাসম্পন্নমাত্রেরই এই একই কথা চিরসত্য; কবি কালিদাস ইহার প্রমাণ; রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা অন্যথা হইবে কেন? কবির নোবেল প্রাইজ পাইবার পরেই এই বিদ্বেষবিষ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। কবির দেশ-বিদেশে খ্যাত সুনামে মিত্রতাপন্নেরাও ঈর্ষ্যাপন্ন হইয়াছিলেন। এই সকল বিদ্বেষীর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নের কুটিলতায় ইঁহারা বিদ্বেষবিষ উদ্গিরণ করিতেন, উদ্দেশ্য, কবির এই খ্যাতি অমূলক, ইহার মধ্যে কোন কূটকৌশল আছেই। কূটপ্রশ্নে বিপন্ন হইয়া আমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতাম, 'হাঁ না' কিছুই বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতাম না; কোন প্রকারে তাঁহাদেব এই ঈর্ষামূলক কূটপ্রশ্ন হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

ইংরাজী-রচনায় কবির শক্তিতে সংশয়বুদ্ধি—একদিন প্রাতঃকালে দেখা করিবার জন্য আমি স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাসায় গিয়াছিলাম। কুশল প্রশ্নের পরে তিনি আমার অভিধানের কথা পাড়িলেন এবং তদ্বিষয়ে উভয়ের বক্তব্য-শ্রোতব্য শেষ হইলে, ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন,—অনেকেই সন্দেহ করেন, 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত নয়, অন্যেরই রচনা। আমি তখন তাঁহাকে স্বকীয় মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—আমার এ বিষয় কোন সংশয় নাই, এ অনুবাদ রবীন্দ্রনাথেরই। পূর্বে কবির এ শক্তির কোন প্রামাণ না পেলেও, এ শক্তি তাঁর মূলেই ছিল না, এটা বিশ্বাস করি না, শক্তি নিশ্চয়ই ছিল, কোন কারণে ইহা প্রকাশ পায় নি। আমি আর কোন কথা বলি নাই।

কবি যখন বিলাতে অধ্যাপক মর্লির ইংরাজী সাহিত্যের শিষ্য ছিলেন, তখন অধ্যাপক একদিন তাঁহার ছাত্রদিগকে ইংরাজীতে বিষয়-বিশেষের প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অভিমত হয় নাই বলিয়া অধ্যাপককে দেন নাই। একদিন অধ্যাপক তাঁহার প্রবন্ধ দেখিতে চাহিলে, অগত্যা কবি প্রবন্ধটি আনিয়া দিলেন। শুনিয়াছি কবির বন্ধু স্বর্গগত লোকেন্দ্র-নাথ পালিত এই প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রবন্ধ শুনিয়া রবীন্দ্র-নাথের ইংরাজী-রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিষ্যাবস্থাপন্ন রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়াবস্থায় ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি যে অধিকতর উৎকর্ষলাভ করিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

আমি কবির মুখে শুনিয়াছি,—আমি চিরকালই বাংলায়ই কবিতা প্রবন্ধাদি লিখি, ইংরাজীতে লিখতে পারি, এটা আমার ধারণাই ছিল না। ইংরাজীতে লেখার পত্র অজিতকে (অজিত কুমার চক্রবর্ত্তীকে) দিয়েই লিখিয়েছি। এখন দেখ্‌ছি, আমার লেখা ইংরাজী প্রশংসার বিষয়ই হয়। তবে বাঙ্‌লা যেমন লেখনীর মুখে সহজেই আসে, ইংরাজী তত স্পষ্ট হয় নি, পরে হয়ত হ'তে পারে।

আনন্দেই কবির জীবিতকালের পর্য্যাবসান—কবি আনন্দময়ের উপাসক, তাই তাঁহার জীবিতকাল আনন্দেরই অবিরত ধারায় আনন্দসাগরে মিশিয়াছে। তিনি অন্তরের অনন্ত আনন্দধারায় ভাসিয়া গাহিয়াছেন,—

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।

বাজে অসীম নভ, মাঝে আনন্দরব, জাগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা ॥"

আনন্দ গানের মূর্ত্তিতেই বাহিরে প্রকাশ পায়, গান আনন্দের বাহ্যরূপ। এখানে আসিয়া প্রাক্‌কুটীরে বালকদিগের সহিত হারমোনিয়ামের স্বরে তাঁহার গান শুনিয়াছি। সকল ঋতুতেই তাঁহার

প্রাতরুত্থান অভ্যস্ত ছিল; প্রত্যুষে শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে তাঁহার ললিতকণ্ঠের মধুর সঙ্গীতও মধ্যে মধ্যে উপভোগ করিয়াছি। ছায়াভিনয়, অভিনয়, নৃত্যগীতবাদ্য, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ, ঋতুপর্য্যায়ে বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, পৌষোৎসব, বসন্তোৎসব—এইরূপ নানাবিধ আনন্দের অনুষ্ঠানপরিকল্পনায় তিনি স্বীয় জীবিতকাল আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আশ্রমবাসীদেরও সেই সঙ্গে আনন্দ-উপভোগের সীমা-পরিসীমা ছিল না—আশ্রমজীবন আনন্দেব জীবনই ছিল। অভিনয় অভিমতভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত তিনি বার্দ্ধক্যেও অনলসভাবে ছায়াভিনয়ে যোগ দিয়া নাটকীয় পাত্রগণকে উপদেশ দিতেন এবং অভিনয়সৌষ্ঠবে তাঁহার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইল, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক অভিনয়ে উপস্থিত থাকিতেন। 'ঘরোয়া'য় জানা যায়, তাঁহার এই অভিনয়ের আনন্দধারা যৌবনের প্রারম্ভে আরম্ভ হইয়া ধারাবাহিকভাবে বার্দ্ধক্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবে একবার তিনি সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনেতা সাজিয়াছিলেন। এই ভূমিকায়, "আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমাব কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?" লক্ষেশ্বরের উদ্দেশ্যে এই অভিনেয অংশটুকু আমার চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। 'রাজা' নাটকেও সুরঙ্গমার ভূমিকায় রঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"ভোর হ'ল বিভাবরী, পথ হ'ল অবসান।
শুন ঐ লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হ'লি ওবে পান্থ, রজনীজাগরক্লান্ত,
ধন্য হ'ল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ॥ ইত্যাদি।

দূর অতীতের কথা হইলেও, তাঁহার কলকণ্ঠের অনুরণন এখনও এই গীতির স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠে।

বৈষ্ণবকবির পদাবলী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী তিনি সমালোচকের বুদ্ধিতে অভিনিবেশপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলেন; ঐ সকল কবির পদাবলী-গ্রন্থের স্থানে স্থানে অধীত পদে তাঁহার মন্তব্যেরও চিহ্ন দেখা যায়। আশ্রমে তাঁহার উদ্যোগেই দুই-তিন বার কীর্ত্তনে জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীর গান শুনিয়াছি, সে সভায় কবিও উপস্থিত ছিলেন, মনে হয়। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পৌষোৎসবে প্রথমে যেবার কৃষ্ণলীলা যাত্রা করিতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে আসরে কবি উপস্থিত ছিলেন ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে অতিথিশালার প্রাঙ্গণে একবার কথকতাও শুনিয়াছি, কবি সে সভায় ছিলেন।

কবির প্রভুত্ব—রবীন্দ্রনাথ অনেকেরই প্রভু ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভুত্বের সঙ্কটে কেহ কখন বিপন্ন হইয়াছেন, এ কথা মনে হয় না। বারবার শত্রুতা করিয়াও অধীনস্থ শরণাগত হইলে, সেই শত্রুর প্রতি বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে এইরূপ প্রতিকূল আঘাত তাঁহার প্রভুজনোচিত চরিত্রের মহত্ত্বই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে; মিত্রের চক্ষে মিত্রজ্ঞানে শত্রুর দোষগুণও তাঁহার মনে স্থান পাইত না। "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে। আমার "গুণস্মৃতি" প্রবন্ধও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভূপেন্দ্রনাথের অবসর—দীর্ঘকাল কার্য্যের পরে ভূপেন্দ্রনাথ কবিকে অবসরগ্রহণের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। কবি প্রথমে ইহাতে সম্মতি দেন নাই। কিন্তু পরে ভূপেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবসরগ্রহণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন,—আমার প্রতি কবির বিশেষ স্নেহ তাঁহার সম্মতির অন্তরায় হইবে, জানি,

কিন্তু ভবিষ্যতে অর্থকৃচ্ছে, তিনি আমাকে লইয়া বিপদগ্রস্ত হইবেন, ইচ্ছা থাকিলেও, আর্থিক অসামর্থ্য সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শক্ত হইবে না; তখন রাখাও কষ্টকর, পক্ষান্তরে অবসরগ্রহণের কথায়ও তাঁহার বিশেষ সঙ্কোচবোধ হইবে। কবির এই ভবিষ্যৎ উভয়সঙ্কটের কথা ভাবিয়াই অবসরগ্রহণ শ্রেয় মনে করিলাম।

অবসরগ্রহণের পরে তাঁহার নামে আশ্রমের অর্থ আত্মসাৎ করার একটা কলঙ্ক উঠিয়াছিল; ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। কবি যথার্থই বলিয়াছেন, —সমানভাবে সকলেরই মনোরঞ্জন বিষম সমস্যার কথা। সকলের সকল মনোবৃত্তি একরূপ হয় না, ভিন্ন হইবেই; এরূপস্থলে, বিষম বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া, সমবৃত্তিগুলি লইতে পারিলে, কাহারও মনে দ্বেষ হিংসা থাকে না, শান্তিলাভই হয়। ইহা কবির ভাষা নহে; কোনও পুস্তকে কবির এই বিষয়ে লেখা যাহা পড়িয়াছিলাম, ইহা তাহারই তাৎপর্য্য।

রবীন্দ্রকথা-সংগ্রহ

জীবন কর্ম্মময়, অর্থাৎ কর্ম্মের ঘটনাপরম্পরাই জীবন। সুখ-দুঃখে জয়-পরাজয়ে কর্ম্মের বিষয় বিচিত্র, এই বিষয়বৈচিত্র্যে অন্তরের অন্তঃস্থিত গুণাগুণ প্রকটিত হয়, এই গুণাগুণের বিচারণা লইয়াই জীবনের সারবত্তা ও অসারতা, সার্থকতা ও ব্যর্থতা। যে জীবনে মনুষ্যের কর্ম্ম নাই—কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য নাই, সে জীবন, নিশ্বাসপ্রশ্বাস থাকিলেও, ভস্ত্রার ন্যায় মৃতই। তাই বলি কর্ম্মই জীবন, কর্ম্মেই জীবনের উৎকর্ষ সূচিত হয়। অনুসন্ধান করিলে মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবে কোন-না-কোন গুণ লক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে, তবে যে সকল গুণে মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়, যাহা মনুষ্যকে উৎকৃষ্টতর লোকে অধিবাসের যোগ্য করিয়া তুলে, তাহা মহাত্মার মহাপুরুষেব সর্বাতিশায়ী গুণগ্রাম, ইহার অধিকাবী সুবিরল, সুবিরল বলিয়াই সেই দেবতাত্মা মহাপুরুষের স্থান সমাজে সর্বোচ্চতম, তিনি পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয়।

কর্ম্মবীব রবীন্দ্রনাথ এই মহাপুরুষোচিত গুণগণের অধিকারী হইয়াই সংসাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাব জীবিতকাল কর্ম্মপরম্পরায়ই পর্য্যবসিত। কর্ম্মেব বৈচিত্র্যে তাঁহার চবিতাবলী নানাবিচিত্রবিষয়িণী। "আলাপচারী ববীন্দ্রনাথ" হইতে তাঁহার নানাগুণময়ী চবিতকথাব মধ্যে বিশিষ্ট কযেকটি এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণকে উপহাব দিব।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রী গৃহাশ্রমীর গার্হস্থ্যের প্রধান সহায়। সংহিতায় যে সকল গৃহস্থধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানে স্ত্রীর আনুকূল্যই প্রধান সাধক। যেমন সকল নদনদীই সাগরেই সংস্থিতি লাভ করে, সেইরূপ সকল আশ্রমীই গৃহস্থের সাহায্যেই অবস্থিত, এই হেতু গৃহী জ্যেষ্ঠাশ্রমী,

এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কন্যাও অতি যত্নে পালনীয় ও রক্ষণীয়। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষা কেবল বিদ্যাশিক্ষা (লেখাপড়া শেখা) বা কলাশিক্ষা অর্থাৎ নৃত্য গীত বাদ্য নানাবিধ চিত্রবিদ্যাশিল্পাদির শিক্ষা নহে। এই সকল বিষয় শিক্ষণীয় বটে, কিন্তু গৃহস্থধর্ম্মের পক্ষে ইহা শিক্ষার গৌণবিষয়, যে শিক্ষায় পত্নী নৈপুণ্য লাভ করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে পরিপাটিপূর্বক পরিপালিত ও পরিচালিত করিতে পারেন, সেই স্ত্রীশিক্ষাই মুখ্যশিক্ষা। তাই "হিতোপদেশে" কবিবাক্য—"সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা"—যিনি গৃহকর্ম্মে নিপুণা, তিনিই যথার্থ ভার্য্যা। অজরাজের ইন্দুমতী যেমন গৃহস্থকার্য্যে কুশলা গৃহিণী তেমনি ললিত নৃত্যগীতাদি কলায় প্রিয়শিষ্যা ছিলেন। যে সকল গুণের অধিকারিণী যুবতী বস্তুত গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, কালিদাস শকুন্তলা নাটকে চতুর্থাঙ্কে অষ্টাদশ শ্লোকে সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তপোবনে বল্কলকাষায়ধারিণী রাজসুতা সতীত্বের দেবীপ্রতিমা সাবিত্রীর তপোবনবাসী ভ্রষ্টরাজ্য শ্বশুর শ্বশ্রূ ও স্বামীর কায়মনোবাক্যে পরিচর্য্যায় প্রীতিসাধন দরিদ্র গৃহীর গৃহে অক্ষুণ্ণ গৃহিণীপনার দেদীপ্যমান আদর্শ, এ আদর্শ বিদ্যাকলা শিক্ষার বিষয়ীভূত নহে। ইহা কেবলমাত্র নিত্য আবশ্যক গৃহকর্ম্মে গৃহিণীর নৈপুণ্যেরই কথা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে স্ত্রীশিক্ষার অর্থাৎ বিদ্যা-শিক্ষা ও নানা কলাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, গৃহস্থধর্ম্মের পক্ষে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, ইহা গৌণ বিষয়, সংসারে সংসারী হইয়া বধূ গৃহকর্ম্মে পরিপক্ব গৃহিণী হইবেন, সংসার সুখের সংসার, সোনার সংসার হইবে, ইহাই স্ত্রীশিক্ষাব মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিষয়ই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—"সংসারে মেয়েদের একটা মস্তবড়ো দাবি আছে, যেখানে সে সমস্ত কিছুর জন্যে ভাববে, দেখবে, যত্ন নেবে। সেখানে যারা উদাসীন, আমি তাদেব

প্রশংসা করিনে, সেখানে তো আর পুরুষেরা ভাবতে পারে না, তাই মেয়েদের এটা মস্তবড়ো কর্তব্যও।"

"মেয়েদের কাজে এত বাধাবিঘ্ন, তাদের আছে ঘরকন্না, তাদের আছে মাতৃত্বের গৌরব। সে যা-ই হোক না কেন, এসবের হাত থেকে কোনো মেয়ের রেহাই নেই। আমি একে খারাপ বলছিনে, এরও একটা দাম আছে··।"

পূর্বে বলিয়াছি, গৃহিণী গৃহীর গৃহধর্ম্মে প্রধান সহায়। গৃহী ধনীই হউন, আর দরিদ্রই হউন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না; যে গৃহে গৃহী গৃহিণী পরস্পরের মনে মন মিলাইয়া গৃহস্থধর্ম্ম পরিপালন করিতে পারেন, সে গৃহে দারিদ্র্য থাকিলেও, সে দারিদ্র্যে তীব্রতা নাই। সেই দীনতার মধ্যেও গৃহস্থ স্বর্গীয় সুবিমল সুখ উপভোগ করেন; এ সুখ ধনবান্ গৃহস্থের গৃহিণীর সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত গৃহসুখ অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহে। সুখ মানসধর্ম্ম—গৃহিগৃহিণীর মনোধর্ম্মের ঐক্যবন্ধন থাকিলেই গৃহস্থধর্ম্মের সর্বাবস্থায়ই গৃহী সুখী হন—ধনি-নির্ধনের গার্হস্থ্যের সুখদুঃখের তারতম্যের কথা মনে উঠিতেই পারে না। দরিদ্র গৃহস্থ নিজের দীনতার মধ্যেই দরিদ্রের ছোটখাটো গৃহকর্ম্মে গৃহিধর্ম্ম পালন করিয়া যে পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হন, তাহা ধনী গৃহাশ্রমীর গার্হস্থ্যসুখেরই তুল্য। নিজের শ্রমলব্ধ শাকান্নেই তাঁহার পরম পরিতৃপ্তি। ধনীর দ্বারে হাত পাতিয়া পাওয়া হাত-ভরা রত্নরাজিও সেই সন্তোষের কণামাত্রও আনিয়া দিতে পারে না—পক্ষান্তরে, সে ভিক্ষার রত্নরাজি ধিক্কারের সহিত অবহেলারই বিষয় হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শিশু"তে "পূজার সাজ" কবিতায় দরিদ্র গৃহস্থের এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, দরিদ্র গৃহিণীর দীনতার মধ্যে কত প্রদীপ্ত তেজস্বিতা, অন্তঃকরণের কত মহত্ত্ব। ইহা অশিক্ষিতা দরিদ্রা গৃহিণীর আদর্শ-চিত্র। "স্মরণে" কবি স্বীয় পত্নীকে "গৃহলক্ষ্মী" বলিয়াছেন; যে স্ত্রীশিক্ষায় পত্নী গৃহলক্ষ্মী হইয়া

গৃহীকে লক্ষ্মীমন্ত করেন, সংসার সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষারই পক্ষপাতী, প্রত্যাশাও করে।

মহামানব—খণ্ড ভারত ঐক্যমন্ত্রের বন্ধনে অখণ্ড ভারত করিয়া গড়িয়া তোলার কথা কবির কাব্যে দুর্লভ নহে। কবি রঙ্গলাল দুঃখের করুণকণ্ঠে গাহিয়াছেন ;—

"আর কি সে দিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ হবে মননে বচনে।"

হেমচন্দ্রের কাব্যে সুগম্ভীর শৃঙ্গনাদে ভারতের অখণ্ডত্বের মন্ত্র বাজিয়া উঠিয়াছে ;—

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।"

নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" কাব্যে দেখিতে পাই ,—

"(বুঝিলাম) এ অগ্নিপরীক্ষা বিনা হইবে না নিরমাণ
ধর্ম্মরাজ্য ধরাতলে, হইবে না কদাচিত
খণ্ড এ ভারতে মহাভারতরাজ্য স্থাপিত।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতসঙ্গীতে" গীত হইয়াছে ,—

"মিলে সব ভারতসন্তান!
একতান-মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতেও এই ভারতের মহামানবের মহামন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,—

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও মহামানবের সঙ্গীতে ভারতবাসীরই ঐক্যমন্ত্রে আহ্বান মন্দ্রস্বরে গীত হইয়াছে ;—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

*　　　*　　　*

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত, সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল-ঘট হয়নিকো ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

পূর্ব পূর্ব কবিগণ খণ্ডভারতকে অখণ্ডভারত করিবার নিমিত্ত যে মহামানবের সঙ্গীতের ধুয়া তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই ধুয়া ধরিয়া তারতরস্বরে গাহিয়া কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার প্রাণের আরাম বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠায়। তিনি ভারতবাসীকে জাতিবর্ণ-ধর্ম্মনির্বিশেষে এখানে আহ্বান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনেব ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হয়, তাঁহার মহামানব কেবল ভারতীয় নহে, ইহা ব্যাপকতর অর্থে সম্মেলনার্থ আহূত বিশ্ববাসী মহামানবের মহা-আমন্ত্রণমন্ত্র। এই মহা-আমন্ত্রণমন্ত্রের কথা মহাত্মা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথমেই উদিত হইয়াছিল, এই হেতু তাঁহাকে এই মহামানবযুগের অবতারবিশেষ বলিলে, অশোভন হয় না।

সামাজিকতা—গান্ধীজী কলিকাতায় আসিবেন শুনিয়া, একবার শান্তিনিকেতনে আসার জন্য কবি তাঁহাকে তার করিয়াছিলেন। গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে তারে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার কলিকাতায় থাকার

দিনগুলি কাজের ক্রমিক ধারায় এমন গাঁথা হইয়াছে যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের একটুও অবকাশ নাই। এই তার পাইয়া কবি বলিয়াছিলেন,—"কী করা যায়। গান্ধীজী আসছেন ক'লকাতায়, অথচ দেখা হবে না। মহা সমস্যা। আমার এখানে এলেন না বলে, আমিও ক'লকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব না, এটা নেহাত ছেলেমানুষি দেখাবে। ক'লকাতায় গিয়ে একবার দেখা ক'রতেই হবে।"

উৎসবে বা পর্বদিনে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক কর্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ নীচু-বাঙলায় এক নিভৃত আশ্রমকুটীরে বাস করিতেন। পৌষোৎসবে বসন্তোৎসবে নববর্ষারম্ভে তিনি বড়দাদাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইতেন। মহাপুরুষেরাই সমাজে কর্তব্যের অনুষ্ঠানে পথপ্রদর্শক, তদিতর ব্যক্তিরা সেই পথ অনুসবণ করিয়া সামাজিক কর্তব্য পালন করেন।—ইহা গীতার উপদেশ-বাণী।

বিজয়ার উৎসবে প্রণাম করিবার জন্য উত্তরায়ণে সম্মিলিত শিক্ষক ও বালকবালিকাগণেব জন্য তিনি বিশেষভাবে মিষ্টান্নভোজেব ব্যবস্থা করিতেন। বালকবালিকারা কবির সমধিক প্রীতিভাজন ছিল। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়াই ইহাদিগকে খাওযাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। বার্দ্ধক্যে তাহাদের বালকস্বভাবের সরলতায় তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিত, তিনি বালক সাজিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের রস বেশ উপভোগ করিতেন। গানের সুরে তাল দিযা শিশু নন্দিনীকে নাচ শিখাইতেও দেখিয়াছি।

তাঁহার নূতন বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে ভোজের আয়োজন হইত—ইহার চর্ব্যচূষ্যাদির বিশিষ্ট ভোজ-ভোক্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ; বালকেরা নামমাত্র থাকিত। পিসীমা (কবির পিসশাশুড়ী) এই ভোজের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—ভোজের উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্ব হইতে নানাবিধ

পশ্চিমসাগরের তীরে তীরে
দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
সময় নাই, বিশ্রাম নাইলে।
এখানকার প্রকৃতির মুখশ্রী
সুন্দর, এখানকার মানুষের
চিত্ত আমার প্রতি
প্রসন্ন, আমার বাণী এদের চিত্ত-
স্পর্শ পেয়েছে, এদের মুক্তি সম-
[illegible] মতো আমার সম্বন্ধে গ্রহণ
করছে এই আমার সান্ত্বনা।

27 SEP 26
7 30 A.M

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু
Santiniketan
Bengal
India

ভোজ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতেন। এই ভোজের সভায় কবি উপস্থিত থাকিয়া ভোক্তার ভোজনশক্তির পরীক্ষা করিতেন। উত্তীর্ণ ভোক্তাদিগের নামোল্লেখ সভ্যতাবিরুদ্ধ।

অস্তোন্মুখরবি-রশ্মি—সূর্য্যোদয়ের ন্যায় সূর্য্যাস্তের দৃশ্যও কবির বিশেষ প্রীতিকর ছিল। তাঁহার শয়নকক্ষের পূর্ব পশ্চিম দুই দিক্ই এই-জন্যই অবাধ-মুক্ত থাকিত। বিকালে কঙ্করকুঞ্জের হিমঝুরি গাছের তলায় পায়চারি করিতে করিতে তিনি আপনার উপমা দিয়া বলিয়াছিলেন ;—"গাছগুলিতে সূর্য্যাস্তের আলো পড়ে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। পাতা ঝরবার সময় এল, সব পাতাগুলি হলদে টসটসে হ'য়ে আছে, তাতে আবার সূর্য্যের আলো, কী চমৎকার মানিয়েছে। আমারি মত ঝরে প'ড়বার আগে গায়ে অস্তরবির রশ্মি পড়েছে। যৌবনের চাইতে এর বাহার কি কোন অংশে কম।"

আত্মনির্ভর—সংসারে যে সকল নিজের কার্য্য আপনার ক্ষমতাতীত নহে, যাহার অনুষ্ঠানে কার্য্যান্তরের কোন ক্ষতি নাই, তাদৃশ কার্য্যের জন্য অক্ষম সাজিয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই উচিত নহে ; ইহা আলস্যের চূড়ান্ত প্রশ্রয়ের একান্ত নিদর্শন। দরিদ্রের ত কথাই নাই, ধনীর পক্ষেও এইরূপ কার্য্যের জন্য পরের সাহায্যের অপেক্ষা করা যথাসম্ভব স্বল্প হইলেই, পরিণাম মঙ্গলপ্রসূ হয়। পরিজন পরিচারক পরিচারিকা আমার অনায়াসসাধ্য সামান্য সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে সতত ব্যাপৃত থাকিবে, আর আমি সুস্থদেহে স্থাণুস্থানীয় হইয়া এইরূপে আলস্যের প্রশ্রয় দিব, ইহা অলস-অকর্ম্মণ্যেরই শোভা পায়। আশৈশব সুখে লালিত পালিত হইলেও, পরমুখাপেক্ষিতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রকে দূষিত করিতে পারে নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন ;—"কারো উপরে নির্ভর ক'রতে হবে—এ বয়সটা ভারি খারাপ। আমি কোনো দিনই কারো উপর নির্ভর ক'রতে ভালবাসিনে। করিও নি

কখনো। কোনো দিন যে ক'রতে হবে এ কথা কখনো ভাবিনি। কিন্তু এখন দেখছি পদে পদে আমাকে অন্যের উপর নির্ভর ক'রতে হ'চ্ছে, অথচ উপায় নেই। নিজের সামর্থ্যেও কুলোয় না। এ যে আমার একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ। এখন কষ্ট হয় ভাবলে।"

শৈশবের সন্ধ্যা ও বার্দ্ধক্যের সন্ধ্যা—বার্দ্ধক্যে কবির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কাজের চাপও বেশ একটু বাড়িয়াছিল। বার্দ্ধক্যে এই চাপ তাঁহার স্বচ্ছন্দে সুখভোগের বিশেষ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাই তিনি শৈশবের সন্ধ্যায় আর বার্দ্ধক্যের সন্ধ্যায় অনুভূত সুখদুঃখের কথা তুলিয়া তুলনা করিয়া ক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিয়াছেন;—"এত সুন্দর সন্ধ্যে করেছে আজ, অথচ আমি এ উপভোগ ক'রতে পারছিনে। কেবলই কাজের চাপ। একটা ফুরোয় ত আর একটা আসে।

কী সুন্দর ছিলুম ছেলেবেলায়, কোনো কাজের চাপ ছিল না। সন্ধ্যে হোত পশ্চিমদিক্ রাঙা হয়ে। পুকুরের পাড়ে বসে থাকতুম, হাঁসগুলো পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাড়ে উঠে আসত, মেয়েরা জল তুলত। এক-মনে দেখতে দেখতে তাতে তন্ময় হয়ে যেতুম। কেমন সুন্দর ছিল সে সব কাল।"

আত্মনির্ভর, সহিষ্ণু—আত্মনির্ভরতা সহিষ্ণুতার প্রসূতি। আত্ম-নির্ভরশীল চাতকবৃত্তি, বিশেষ কষ্টে পড়িলেও অন্যের অনায়াসলভ্য সাহায্যে কষ্টের অবসান করিতে তাঁহারা সহজে প্রবৃত্ত হন না। অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত দুঃখের তীব্রস্বাদ অমৃতবুদ্ধিতে সহ্যবেদন করিয়া অক্ষুব্ধ-ভাবে নীরবে দুঃখলাঘবের কালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কবির চরিত্রে এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতার একটি চিত্র অঙ্কিত আছে। এক সময়ে তিনি যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন, কিন্তু তথাপি পীড়ার নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যের অণুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই, তিনি কাহারও সেবাগ্রহণের

ইচ্ছা বা সেবাস্বীকার করেন নাই। অবশেষে অনাহূত কয়েকটী সেবার্থিনী আসিয়া তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সেবার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া শেষে অত্যাচারে পরিণত হইলে তিনি পীড়িত হইয়া বলিয়াছেন,—"চ'লতে লাগল আমার পদসেবা পুরোদমে। মানাও ক'রতে পারিনে—মহা মুশকিল। টেপার দরুণ পা আরো ব্যথা ক'রতে লাগল। আমি মাঝে মাঝে আর না পেরে বলি—দেখো হয়েছে, আর লাগবে না—কিন্তু কে কার কথা শোনে, পদসেবা চ'লতেই লাগল। তার পব না পেরে, শেষটায় নিচের তলায় চলে আসতে আমাকে বাধ্য হোতে হ'লো। শেষে ঐ গল্পটা লিখি।"

কবির "গল্পগুচ্ছে" যে "নামঞ্জুর" গল্প আছে, সেইটা কবির "ঐ গল্পটা"। তাহাতে যে পদসেবায় বিব্রত হওয়ার কথা আছে, এই সেবার অত্যাচারই তাহার ভিত্তি—ভুক্তভোগী কবির জীবনে প্রত্যক্ষ ঘটনা।

আশ্রমের আবহাওয়া—'আবহাওয়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'জলবায়ু'। যে দেশের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল, সে দেশবাসীর শরীর প্রকৃতির এই অনুকূল সহায়তা পাইয়া আপনিই গড়িয়া উঠে—পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যবান্ সবল হয়। কেবল শরীরের বিষয় কেন, মানুষের শিক্ষার সকল বিষয়েই একটা-না-একটা আবহাওয়া আছেই, যাহাতে তত্তদ্‌বিষয় সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যা, চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা, অন্য বিবিধ শিল্পকলা—সংক্ষেপে সকল কলারই তত্তদ্‌বিষয়ক স্বকীয় আবহাওয়া থাকিবেই। পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ বিষয়বিশেষের তদনুকূল ধারাবাহিক অনুশীলনের উপায়পরম্পরার ফলে তদ্বিষয়ক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। বিশ্বভারতীতে যে নানা বিদ্যার অনুশীলনের যুগ চলিতেছে, তাহা অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের তত্তদ্‌বিষয়ক একান্ত প্রযত্নে সৃষ্ট আবহাওয়ারই পরিণাম, শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্বাচন শিক্ষকের পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না, ইহা সম্পূর্ণভাবে তদ্বিষয়ে বিদ্যার্থীর অনুরাগেরই

অধীন।—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া বালকবালিকাগণের সহজে নমনীয় কোমল মনোবৃত্তি অভিমুখ করিবার জন্য কবি বিশ্বভারতীতে ন্যায্য শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অভিপ্রায়, তাহারা ঐ বিষয়-সমূহের মধ্যে প্রকৃতিগত সহজ অনুরাগের অনুকূল কোন একটা বিষয় নির্বাচন করিয়া একান্ত প্রযত্নে অনুশীলন করিলে তাহাতে কৃতবিদ্য হইতে পারিবে। তাঁহার এই সুকৌশলে বিদ্যাশিক্ষায় অভিমুখ করিবার উপায় সর্বথা সফল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই তিনি স্বীয় বিষয়বিশেষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ;—"যদি এমনি (চিত্রকলার) আবহাওয়া আমবা ছেলেবেলায় পেতুম, হয় তো বা একজন আর্টিস্ট হোলে হোতেও পাবতুম।"

সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধবাসর—দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে গ্রন্থাগারের দ্বিতলে এক শোকসভাব অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় কবি উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সে ভাষা মনে নাই, তাঁহার মন্তব্যেব তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয়,—'শ্রাদ্ধবাসরে শোকসভা ভারতের জিনিষ নয়, এটা বিদেশীয়ের অনুকরণ। মৃত্যুর পরে এক বৎসর অতীত হ'ল, এর মধ্যে মৃতের স্বভাব ক্রিয়াকলাপ প্রবন্ধাদি বা চরিত্রগত কোনো বিষয়ের কোন কথাই একদিনও কারও মনে বিন্দুমাত্র স্থান পায়নি। আর যেমন শ্রাদ্ধবাসর নিকট হ'ল, অমনি সভ্যগণের মনে মৃতের গুণগরিমার নানাবিষয়িণী কথা জেগে উঠলো, তখন তাঁর জীবনের নানা চরিতকথা সংগ্রহ ক'বে কেহ বক্তৃতায়, কেহ কবিতায়, কেহ প্রবন্ধে শোকসভায় প্রকাশ ক'ল্লেন। মৃতের প্রতি কর্ত্তব্য এই সভার অধিবেশনমাত্রে শেষ। আবাব বৎসরব্যাপী নীরবতা। এটা আমি পছন্দ করি না।' পরবর্ত্তী উদ্ধৃতাংশে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি আছে—"মরে যাওয়ার পরেও লোকে কেন যে কামনা করে, তাঁদের নিয়ে হৈ চৈ হোক, তাঁদের লেখার কীর্ত্তির গুণ-গান হোক।

এত বড়ো মূর্খতা এই মানুষেরাই করে। এর চাইতে বড়ো বোকামি আর কিছুতে হোতে পারে না।”

কবির নববর্ষ—কবি যাবজ্জীবন নববর্ষের উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমবাসী অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই কবির সহিত এই উৎসবে আন্তরিক আনন্দে মিলিত হইয়া উৎসব সার্থক করিয়াছেন। কিন্তু কবির মনোমত নববর্ষ আর সাধারণের নববর্ষ এক রকম নহে; তাঁহার মতে প্রত্যেক দিনই লোকের নববর্ষ, এই দৈনিক নববর্ষের সমষ্টি লইয়া কবির অসাধারণ নববর্ষ। তিনি বলিয়াছেন,—“নববর্ষ ধ'রতে গেলে রোজই তো লোকের নববর্ষ। কেননা, এই হচ্ছে মানুষের পর্বের একটা সীমারেখা। রোজই লোকের পর্ব নতুন করে সুরু হয়।”

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা:—শিক্ষিতা, অর্থাৎ ইদানীং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা। (এই প্রবন্ধে ‘স্ত্রীশিক্ষা’ দ্রষ্টব্য)। অশিক্ষিতা, অর্থাৎ যাঁহারা তাদৃশ শিক্ষাপ্রাপ্তা নহেন, কিন্তু সংসারের উপযোগী ক্রিয়াকাণ্ডে সবিশেষ অভিজ্ঞ গৃহিণী। অনেকেরই ধারণা, শিক্ষিতা না হইলে স্ত্রীলোকের সাংসারিক কর্ম্মে প্রেরণার শক্তি হয় না। ইহার সার্থকতা সর্বত্র অব্যভিচারী বলিয়া মনে হয় না। যে নারীর প্রকৃতিতে সহজ প্রেরণাশক্তির বীজ থাকে, তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উন্মেষ-প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যকর হয়, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গৃহিণীরূপে সংসার সুশৃঙ্খল করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, পরে জননীরূপে সুকৌশল প্রেরণা দ্বারা সংসারের নানা কর্ম্মবিভাগে শিক্ষা দিয়া সন্তানগণকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ইঁহাদের পক্ষে শিক্ষার প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, শিক্ষায় ঈদৃশী জননীর বিশেষ উপকারও হইতে পারে; কিন্তু তাদৃশশিক্ষার অভাবে লোকযাত্রার পক্ষে তাঁহাদের

বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। নিপুণা জননী শৈশব হইতেই সন্তানকে নিজ প্রেরণার প্রভাবে স্বীয় অভিমত জীবনের পক্ষে পরিচালিত করেন, সন্তানও জননীর অধীনতায় থাকিয়া ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট ভবিষ্যৎ জীবনের অধিকারী হয়। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী বিদুষী ছিলেন না, ঈশ্বরচন্দ্র মাতার প্রেরণায় পরিচালিত, মাতার চরিত্রপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়া নানা সদ্‌গুণে সর্বত্র সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিচারপতি গুরুদাস মনস্বিনী জননীর অধীনতায় লালিত পালিত হইয়াছিলেন, জননীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। শুনিয়াছি, গুরুদাসের বিচারালয় হইতে আসার পূর্ব্বে তাঁহার জননী একখানি ছোট কাপড় লইয়া বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেন, গুরুদাস সেই ঘরে আসিয়া বিচারকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সেই কাপড়খানি পরিয়া মায়ের সহিত অন্দরে যাইতেন। সন্তানের স্বভাব গঠনে জননীর প্রেরণার প্রভাবের এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কথায় বিশেষ সমর্থিত হইবে,—

"আমাদের গগনদের মা ছিলেন যাঁকে ভুলেও শিক্ষিতা বলা যায় না, কিন্তু কী সাহস আর কী বুদ্ধিতে তিনি চালিয়েছিলেন সবাইকে। তিন-তিনটি ছেলেকে কী ভাবে মানুষ করে তুললেন। তাঁর ইচ্ছায় তাঁরই প্রেরণার প্রভাবে ছেলেরা চলেছে। কারো ক্ষমতা ছিল না তাঁর প্রতিবাদ করা। ছেলেরা তাদের মাকে যা ভক্তি করে, অমন সচারচর দেখা যায় না। তিনি শুধু ছেলে মানুষই করেন নি। তখন তাঁদের জমিদারির অবস্থা ছিল সঙ্কটাপন্ন। অবনের মা সেই অবস্থায় জমিদারি নিজের হাতে নিলেন, নিয়ে শুধু ঋণমুক্ত ক'রলেন, তা নয়, একেবারে নতুন করে দিলেন। শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার মধ্যে যদি তফাত থাকে, তবে এটা কী করে সম্ভব হয়। অথচ এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

দুঃখের আবশ্যকতা ও উপকারিতা—কাপড়ের তানাপড়েনের মত সংসার সুখদুঃখে ওতপ্রোত, অর্থাৎ সুখদুঃখ লইয়াই সংসারযাত্রা। কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা একান্তভাবে দুঃখ হয় না, বা থাকে না; আবর্ত্তনে চক্রনেমির উচ্চ-নীচ দশার মত সুখদুঃখের দশান্তর পরিবর্তনশীল। সংসারে সুখের যেমন প্রয়োজনীয়তা দুঃখেরও তেমনি আবশ্যকতা আছে। শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষে মাস; কৃষ্ণপক্ষ যেমন কষ্টের তীব্র স্বাদে শুক্লপক্ষের মধুরতা স্পষ্ট করিয়া বোধগম্য করে, দুঃখের কঠোর আঘাত তেমনি সুখের স্পৃহণীয়তা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেয়। ইহাতেই দুঃখের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। লৌহখণ্ডের আঘাতে অগ্নিশিলা যেমন গূঢ় স্ফুলিঙ্গ উদ্‌গিরণ করে, সেইরূপ মানুষের অন্তর্গূঢ় গুণগণ নানা কর্ম্মবৈচিত্র্যে প্রকটিত হয়; তখন মানুষ গুণের মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া মনুষ্যলোকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠাপন্নই যথার্থ মানুষ বা মনুষ্যশব্দবাচ্য। ইহাই সংসারে দুঃখের উপকারিতা। নিম্নে উদ্ধৃত কবিবাক্য ইহারই তাৎপর্য্যের ভাষান্তর। "আমি মানুষের জীবনটা এমনি করেই দেখি। মানুষ যখন একবার ঘা খায় বা পড়ে' যায়—একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে, তার পরে মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখনি তার একটা সত্যিকার রূপ হয়।"

শিমুল ও মালতী—আশ্রয় ও আশ্রিত—আশ্রয় ও আশ্রিতের বিষযেব সামঞ্জস্যে সংসারে ধনী ও দরিদ্রের কথা সহজেই মনে আসে। ধনবান্ আশ্রয়, দরিদ্র আশ্রিত—দরিদ্র ধনীর আশ্রয়ে সেবাবৃত্তিতে জীবিকার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করে। কালক্রমে দেখা যায়, সেই দরিদ্রই সেবার জীবনে অর্জ্জিত ধন হইতে বুদ্ধিপূর্বক মিতব্যয়িতায় সঞ্চিত ধনে শেষ জীবনে ধনবান্ ও সুখী হইয়াছে, পক্ষান্তরে সেই ধনীও প্রথমে সুখের জীবন উপভোগ করিয়াছেন, দৈবদুর্বিপাকে বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে

তাঁহার জীবনের শেষভাগ দুঃখভোগের পরম্পরায় অতিবাহিত হইতেছে। সংসারে আশ্রয় ও আশ্রিতের এইরূপ দশাবিপর্য্যয় বিরল নহে। কবি শিমুল-মালতীর কথা লইয়া উপমা দিয়া মনুষ্যজীবনে তাদৃশ অবস্থান্তরের বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"শিমুলকে মালতী কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে ; এখনো শিমূল হার মানে নি ; কিন্তু শিগগিরই ওকে মালতী চেপে মারবে। একদিন মালতীরই জয় হবে। অথচ ওই একদিন শিমুলকে আশ্রয় করে উঠেছে। মানুষের জীবনে এমন কত দেখা যায়।"

বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া"য় দেখা যায়, কবির "বাল্মীকিপ্রতিভা" যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হ'ত, সুতরাং এর অনেকবার অভিনয় হ'য়েছে; এর মধ্যে শেষ অভিনয় আমার প্রবন্ধের বিষয়।

আমার বয়স তখন ১৫।১৬ বছর—পাড়াগাঁয়ের স্কুলে প'ড়তাম—গ্রীষ্মের ও শীতের ছুটিতে ক'লকাতায় আসতাম। আমার বড়দাদা মহর্ষি-দেবের সংসারে খাজাঞ্চি ছিলেন—ক'লকাতায় তাঁর বাসায় থাকতাম, কিন্তু আমার অধিকাংশ সময়ই তাঁর অফিসে কাটত। তাঁর কাছে কবির অনেক কথা শুনতে পেতাম। একবার শীতের ছুটিতে ক'লকাতায় এসেছি—বড়দাদার কাছে শুনলাম, বাবুদের বাড়ীতে "বাল্মীকিপ্রতিভার" অভিনয় হবে—খুব ধূমধাম—প্রত্যহই রিহার্সেল হ'চ্ছে। কবির কলকণ্ঠের গানের ভূয়সী প্রশংসা আগেই লোকের মুখে মুখেই শুনেছিলাম—শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ করার ভাগ্য কখনও হয়নি। তাই অভিনয়ের কথা শুনে বড় আনন্দ হ'ল। দিন গুনতে লাগলাম—ক্রমে অভিনয়ের দিন নিকট হ'ল। তখন বড়দাদা বল্লেন, দু-দিন অভিনয় হবে—প্রথম দিন সাহেব-সুবো, ক'লকাতার বড বড় মান্যগণ্য লোক অভিনয় দেখবেন—পর দিনের অভিনয় সাধারণের জন্য, সে দিন তুমি গেলে দেখতে পাবে। আমি সেই আশায়ই থাকলাম।

বাড়ীতে এই শেষ "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয়ে খুব ধূমধামই হ'য়েছিল সত্যই। এর পরে শান্তিনিকেতনে কবির উদ্যোগে মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের এই নাটকের অভিনয় দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এ সব অভিনয়ের তুলনাই হয় না। তখন লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট। "ঘরোয়া"য় দেখা যায়, মহর্ষিদেব এই অভিনয়ের মূলকারণ, তাঁর কি খেয়াল হ'য়েছিল,

লেডী ল্যান্স্‌ডাউনকে পার্টি দেবেন, তাই তাঁর হুকুম "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয় হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর নিকটে শুনেছি, সত্যেন্দ্রনাথ একবার যখন বিলাত থেকে আসেন, সেই সময়ে সেই জাহাজে লেডী লান্স্‌ডাউন যাত্রী ছিলেন। কথোপকথন-প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ লেডী ল্যান্স্‌ডাউনকে যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আহ্বান করার কথা উত্থাপন করেন। বোধ হয়, একথা ক্রমে ক্রমে মহর্ষিদেবের কানে উঠেছিল, তাই তাঁর এরূপ খেয়াল। মূল কারণ যাই হোক, এইবার "বাল্মীকিপ্রতিভা"র অভিনয় সর্ব্ববিলক্ষণ—খুব জাঁকজমক হ'য়েছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চের সুশোভন সজ্জা—নাটকীয় দৃশ্যপটে স্বভাবের অনুকরণে বনের নিখুঁত পরিপাটি—দস্যুদলপতি ও দস্যুদের অনুরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ, কবির দস্যুপতি বাল্মীকির সাজ—আব আর অভিনেতা অভিনেত্রী, সকলেরই পাত্রোচিত বেশভূষা—সবই বেশ মনোমোহকর হ'য়েছিল—তাই বলি, এ অভিনয় সর্ব্ববিলক্ষণ।

বডদাদার সঙ্গে আমি অভিনয় দেখতে গেলাম। বাডীর মধ্যে যে বিস্তৃত আঙিনা, দেখলাম তা শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট দর্শকে পবিপূর্ণ—মাথায় মাথায় লাগালাগি—মাথায় মাথায় মাথাময়—ন স্থানং তিলধারণে। আঙিনার উত্তবে দালান— তাব বারাণ্ডায় কোন প্রকারে একটু স্থান হ'ল। দূর হ'লেও সেখান থেকে রঙ্গমঞ্চ বেশ দেখা যাচ্ছিল। নাটক আরম্ভ হ'ল। প্রথমে বনদেবীদের নৃত্য—পরে দস্যুদলের আবির্ভাব। অক্ষয়বাবু দস্যুদলপতি। তাঁকে আগেই আমি দেখেছিলাম। তিনি দীর্ঘদেহ স্থূলকায় কাল, তাঁর বেশ একটু ভুঁড়ি ছিল—ঝাপটা চুল—স্বর একটু গম্ভীর। অভিনয়ে তাঁর পাত্রতা বেশ সুসঙ্গত হ'য়েছিল—তাঁর অভিনয়ও সহজ-সুন্দব। সহচর দস্যুদের অভিনয়ও অনুরূপই হ'য়েছিল মনে হয়। আমি এসব দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনে একটা কথা সর্ব্বদাই জাগছিল—সেটা কবির কথা, কতক্ষণে বাল্মীকির বেশে কবিকে দেখব—

কখন তাঁর কলকণ্ঠের গান শুনতে পাব। অত্যন্ত ঔৎসুক্য—তখন দেখলাম, দস্যুপতি বাল্মীকির বেশে কবির প্রবেশ—লম্বা জোব্বা-পরা, গলায় শঙ্খ ঝুলছে—ডাকাত ডাকবার। একে কবির সহজ-মনোমোহন রূপ, তাতে পূর্ণ যৌবনের ললিতলাবণ্যচ্ছটা অনুকূল পোশাক-পরিচ্ছদে সৌষ্ঠবসম্পন্ন—তাতে আবার রঙ্গমঞ্চের পরিস্ফুট আলোকপ্রভা প্রতিভাত—সে সৌন্দর্য্য আরও মনোমোহকর হ'য়েছে। দর্শকেরা কবির সেই বাল্মীকিবেশ দেখে চিত্রার্পিতের মত নিস্পন্দ নির্বাক নির্নিমেষনেত্র। তখন কবির কলকণ্ঠে সঙ্গীত শোনা গেল—কবি গাইলেন,—

"এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে॥
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কি জানি? প্রতি-জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!"
ইত্যাদি।

এর পরে বল্মীকিব প্রস্থান। তার পরে, দৃশ্য কালীপ্রতিমা—বাল্মীকির স্তবগান,—

"রাঙা পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা॥
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর, রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোর উন্মাদিনী-পারা।"
ইত্যাদি।

একে মধুব কণ্ঠ, তাতে সময়োপযোগী বাগেশ্রী-রাগিণীর সুবে ছন্দোবন্ধন—সেই স্তুতিগীতি স্বরসম্পদে সম্পূর্ণ হ'যে আসর একেবারে মাত করে ফেল্লে! গান গাওয়া শেষ হ'লো—বাল্মীকি নেপথ্যের অভিমুখ হ'লেই, দর্শকদেব মধ্যে মহাকোলাহল উঠলো—"এন্‌কোর", "এন্‌কোর"! সকলেই কবির সেই এক-ফেরতা গান শুনে তৃপ্তি লাভ ক'ত্তে পারেন নি—আবার শোনবার জন্য সমুৎসুক! কবি কি ক'রবেন—আবার ফিরলেন—গানের পূর্ববৎ আমূল পুনরাবৃত্তি হ'ল—কবি নেপথ্যে অন্তর্হিত হ'লেন। আর "এন্‌কোর" হ'ল না, কিন্তু সকলে অতৃপ্ত না হ'লেও, সুতৃপ্ত হওয়ার

বীণাপাণির শুভক্ষণে উচ্চারিত এই বরবাণী বরপুত্র কবির জীবনে সত্যসত্যই বর্ণে বর্ণে সার্থক হ'য়েছিল।

এই প্রবন্ধে "বাল্মীকিপ্রতিভা"র যে সব দৃশ্য বর্ণনা ক'রলাম তাহা আমার প্রত্যক্ষ। দেখার পরে প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হ'য়েছে, সব মনে না থাকা, আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যে কয়টি দৃশ্য মনে ছিল, তাহাই লিখলাম—পর পর বিষয়গুলির বর্ণনার কোন অভিপ্রায় নাই। *

---

* অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ মহাশয় আমার কাছে কবির এই অভিনয়ের কথা শুনে, আমার প্রত্যক্ষ বিষয় ব'লে, আমাকে এটা লিপিবদ্ধ ক'ত্তে বলেছিলেন, তাই এই প্রবন্ধ।

ব্রহ্মবিদ্যা ও তন্মূলক-ধর্ম্মোপাসক

ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেয়োজ্ঞান, পরা বিদ্যা। ইহা মুখের কথা নহে, অর্থাৎ কেবল মুখে ব্যাখ্যা করিলেই ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয় না; ইহার ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যেরই বিষয়; বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদ্যালাভ কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। শ্রুতিতে এই সাধনের যে সোপানশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধক তাহার নিম্নতম সোপান হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ-উচ্চতর সোপান সাধনার বলে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধতম সোপান ব্রহ্মবিদ্যায় বা আত্মজ্ঞানে অধিরোহণ করিলে, বস্তুতঃই ব্রহ্মবিৎ হন। অসিদ্ধের মুখে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদের মহাবাক্যের আবৃত্তি মুখেরই কথামাত্র—লোকের মনোমোহনের উপায়—বাহ্য বাগাড়ম্বর-মোহিত বিচারমূঢ় জনসমাজে মহাজ্ঞানীর পদবীলাভের অন্তঃ-সারশূন্য পন্থামাত্র। শুকমুখে উচ্চারিত কৃষ্ণনামের ন্যায়ই উহা নিরর্থক।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যার আখ্যায়িকায় ব্রহ্মবিত্তম ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নারদকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের যে উপায়পরম্পরার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আত্মজ্ঞানলাভ যে কঠোর সাধন-সাপেক্ষ, তাহা বুঝা যায়।

কৃতকর্ত্তব্য সর্ববিদ্যাবান্ কিন্তু আত্মজ্ঞানাভাবে শোকসন্তপ্তহৃদয় নারদ যথাশাস্ত্র ভগবান্ সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বাক্যে নিবেদন করিলেন,—"ভগবন্! আমাকে জানান," অর্থাৎ আমি আত্ম-জ্ঞানলাভের আশায় উপস্থিত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন।

নারদের এইরূপ প্রার্থনায় সনৎকুমার কহিলেন,—"তুমি আত্মবিষয়ে যাহা কিছু জান, তাহা বলিলে, তোমার বিজ্ঞানের ঊর্দ্ধ বিষয়ের উপদেশ দিব।"

সনৎকুমারের এই বাক্যে নারদ কহিলেন,—"ভগবন্! আমি ঋগ্বেদাদি হইতে নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদি পর্য্যন্ত বিদ্যা জানি। আমি

মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিৎ হইয়াছি, আত্মবিৎ হই নাই। ভবাদৃশ ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকটে শুনিয়াছি,—"আত্মবিৎ শোকাতীত", আমি শোকতপ্ত; ভগবন্! শোকার্ত্ত আমাকে আত্মজ্ঞান দিয়া শোকসাগর-পারে উত্তীর্ণ করুন।"

সনৎকুমার কহিলেন,—"তুমি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তাহা নামী, অর্থাৎ বিকারী। তুমি, বিষ্ণুবুদ্ধিতে প্রতিমার উপাসনার ন্যায় "নামই ব্রহ্ম" এই বুদ্ধিতে নামেরই উপাসনা কর। রাজা যেমন স্বরাজ্যে যথাকাম বিচরণ করেন, নামের উপাসকও সেইরূপ যাহা-কিছু নামের গোচর, তত্তদ্‌বিষয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করেন।"

নামরূপে ইষ্টদেবতার সাধনার বিবরণ পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতিতে যাহা আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিব :—

(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাপিষ্ঠ দস্যু রত্নাকর রামনামে দীক্ষিত হইয়া ষষ্টিসহস্র বৎসর নাম জপ করিয়া পাপমুক্ত মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন।

(২) ভাগবতে (৭-৫-২৩) ভক্তির যে নব লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তন অর্থাৎ নামোচ্চারণ বা নামসংকীর্ত্তন তাহার অন্যতম।

(৩) উত্তানপাদপুত্র ধ্রুব নারদের উপদেশে দ্বাদশাক্ষর ভগবন্মন্ত্রে বাসুদেবনাম জপ করিয়া সিদ্ধিতে ধ্রুবলোকে বাসের অধিকারী হইয়াছিলেন।

(৪) চৈতন্যদেব হরিনামসংকীর্ত্তনে প্রেমের বন্যায় দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। সুরাপানমত্ত জগাই-মাধাইএর মরুবৎ নীরসকঠোর হৃদয় নামকীর্ত্তনে ভক্তিরসে দ্রবীভূত ও আপ্লুত হইয়াছিল। "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক নামাবলী চৈতন্যদেবের নামজপের জপমালা ছিল। অকিঞ্চিৎকর অতুল ঐশ্বর্য পরিহার করিয়া বিষয়-বিতৃষ্ণ অকিঞ্চন সনাতন ইষ্টনামজপে একান্ত নিরত তন্ময় ও সংসারমুক্ত হইয়া পরমপদপ্রাপ্ত হন।

(৫) রামানন্দ কবীর তুলসীদাস রামনামজপের তপস্যায় তপঃসিদ্ধ তপস্বী ছিলেন। নাম ও নামী তত্ত্বতঃ অভেদ হইলেও তুলসীদাস নামী অপেক্ষা নামেরই নিরতিশয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, নামী স্বল্পসংখ্যককে মুক্ত করেন, কিন্তু নামজপে মুক্তের সংখ্যা সংখ্যাতীত। (রামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২৪ শ্লোক)।

বাল্যকালে বৈষ্ণবের মুখে কৃষ্ণের যে অষ্টোত্তরশত নামের গান শুনিয়াছিলাম, নামরূপে ব্রহ্মসাধনার উপদেশে সেই গানের পদাবলীর সাম্য মনে হয়। তাহাতেও নামভজনের মহিমার এইরূপ বর্ণনা আছে ;—

"নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অসংখ্য প্রভুর নাম মহিমা অপার ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরে আপনি শ্রীহরি ॥
শঙ্খ ভরি সুবর্ণ গো কোটী কন্যা-দান।
তথাপি না হয় 'কৃষ্ণ'-নামের সমান ॥

রাধিকা 'শ্যাম'-নামে শ্যামের উপাসিকা, তাই শ্যামনামের মধু তাঁহার মুখে লাগিয়াই ছিল—শ্যামনাম-জপে সর্বদা সবই তাঁহার চক্ষে শ্যামময় হইয়াছিল। তাই চণ্ডীদাস তাঁহার রাগে রাগ মিশাইয়া গাহিয়াছেন,—

"(শ্যামনাম) কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"
"শ্যাম শ্যাম বলি, সদা শ্যাম হেরি,
সকল সঁপিল শ্যামে।"

উপনিষদের নামরূপে ব্রহ্মোপাসনা, আর বৈষ্ণবের নামগানরূপে রামের বা কৃষ্ণের ভজন, একই—নাম-ব্রহ্ম, নামরাম, নাম-কৃষ্ণ—

সকলেরই উপাসনা তত্ত্বতঃ অভেদ। ইহা নামজপ-যজ্ঞ, অভ্যাসযোগ-বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথ ইষ্টনামজপের পক্ষপাতী ছিলেন। একান্তে শ্রেষ্ঠজপ মানসজপ তাঁহার অভিমত জপ ছিল, তাই তিনি নামজপের গানে গাহিয়াছেন ;—

"তোমারি নাম ব'লব নানা ছলে।
ব'লব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে ॥
ব'লব বিনা ভাষায়, ব'লব বিনা আশায়,
ব'লব মুখের হাসি দিয়ে, ব'লব চোখের জলে ॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম।
সেই ডাকে মোর শুধু, শুধুই পূরাব মনস্কাম ॥
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে,
ব'লতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে ॥"

সনৎকুমারের 'নাম-ব্রহ্ম' উপদেশের পরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! নাম অপেক্ষা অধিকতর কি?" সনৎকুমার কহিলেন,—"অধিকতর বাক্, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়—জিহ্বামূলাদি অষ্ট স্থান—জিহ্বামূল, উরঃ, কণ্ঠ, শিরঃ, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা, তালু। ইহারা বর্ণসমূহের অভিব্যঞ্জক কারণ, বর্ণ-উচ্চার্য্য। পুত্র হইতে পিতা প্রধান, সেইরূপ কারণরূপ বাগিন্দ্রিয় কার্য্যরূপ বর্ণ হইতে প্রধান। "এই ঋগ্বেদ," ইহা বাক্য হইতে জানা যায়। যিনি ইহার উপাসক, তিনি যাহা কিছু বাগ্‌গোচর, তত্তদ্‌বিষয়ে যথাকাম বিচরণ করেন, ইহা ব্রহ্মবিদ্যালাভের দ্বিতীয় সোপান।"

নারদ আবার পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলেন,—"ইহা অপেক্ষা অধিকতর কি?" সনৎকুমার উত্তর করিলেন,—"অধিকতর মনঃ; মুষ্টি যেমন দুইটি আমলক-ফল ব্যাপ্ত করে, অর্থাৎ আমলক দুইটি যেমন মুষ্টির অন্তর্ভূত

হয়, সেইরূপ 'নাম' ও 'বাক্' মনের অন্তর্গত, অর্থাৎ মনন দ্বারা বলিবার ইচ্ছা হয়, তৎপরে নাম বা মন্ত্রোচ্চারণ হয়। মনোব্রহ্মের উপাসক মনোগোচর বিষয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করেন।" ইহা ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় সোপান।

নারদের এইরূপ প্রশ্নপরম্পরার উত্তরে সনৎকুমার পরে পরে 'সঙ্কল্প' 'চিত্ত' 'ধ্যান' হইতে 'আশা' (তৃষ্ণা কাম)-পর্য্যন্ত কার্য্যকারণভাবাপন্ন সকল ভূমি ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ ব্রহ্মভাবে, অর্থাৎ 'সঙ্কল্পই ব্রহ্ম'—এইরূপে, উপাসনার উপদেশ দিয়া নারদকে বলিলেন,—'আশা' হইতে 'প্রাণ' (প্রজ্ঞাত্মা) অধিকতর—প্রাণ কারণ, কার্য্য আশা। রথচক্রের নাভিতে অরসমূহের ন্যায় এই প্রাণে সকল জগৎ সংপ্রবেশিত রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান সকল জগৎই প্রাণ। এই প্রাণবিষয় জ্ঞানবান্ 'প্রাণবিৎ' অতিবাদী অর্থাৎ নামাদি আশান্ত সব সোপান অতিক্রম করিয়া, অধিকতর, অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সোপানের কথা বলিতে পারেন।

'সর্বাতিশয় প্রাণ স্বীয় আত্মা, সর্বাত্মা'—ইহা শুনিয়া নারদ মনে করিলেন,—"ইহার পরে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, অতএব আর প্রশ্ন করিলেন না, নিবৃত্ত হইলেন। সনৎকুমার তখন মিথ্যাব্রহ্মজ্ঞানে পরিতুষ্ট নারদকে কহিলেন,—"আমি যে প্রাণবিৎ অতিবাদী বলিলাম, ইহা পরমার্থতঃ নহে, সর্বাতিশায়ী তত্ত্ব 'ভূমা' পরমার্থতঃ সত্য ; যিনি ইহা জানেন, তিনি অতিবাদী।" তখন নারদ কহিলেন,—"ভগবন্! আমি সত্য দ্বারাই অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।"

নারদের এই প্রশ্নে সনৎকুমার কহিলেন,—"সত্য (সত্যকথন), বিজ্ঞান (সত্যবিজ্ঞান), মতি (মনন, তর্ক, মন্তব্য বিষয়ে আদর), শ্রদ্ধা (মননের হেতুভূত আস্তিক্যবুদ্ধি), নিষ্ঠা (ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ গুরুশুশ্রূষাদিপরতা), কৃতি (ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তৈকাগ্রতাকরণ), সুখ—এইগুলি কার্য্যকারণভাবাপন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞানের সোপানপরম্পরা ; ভূমা (মহৎ, নিরতিশয় বহু) সুখের কারণ। 'অল্প', ভূমা অপেক্ষা সাতিশয়

অর্বাচীন; অল্পে সুখ নাই, কারণ, অল্প অধিকতৃষ্ণাজনক, তৃষ্ণা দুঃখের বীজ। এই ভূমাতত্ত্বে অন্য কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বিজ্ঞাতব্য ও মন্তব্য থাকে না, অর্থাৎ ইহা দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদির বিকল্পের অবিষয়; আর যাহাতে অন্য কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বিজ্ঞাতব্য ও মন্তব্য থাকে, অর্থাৎ যাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদির বিকল্পের বিষয়, তাহা অল্প। ভূমা অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, অল্প মর্ত্ত্য, অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তৎক্ষণভাবী, স্বপ্নেই তাহার সত্তা, জাগরণে তাহার অসত্তা বা অভাব। ভূমা, এক অদ্বিতীয় সৎ তত্ত্ব; অল্প, অবিদ্যাজন্য অনেক অসৎ সংসারব্যবহার হেতু ভূমা হইতে ভিন্ন।"

ভূমার এইরূপ বিবৃতিতে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! এই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত?" সনৎকুমার কহিলেন,—"স্বীয় মহিমায়, অর্থাৎ আত্মার মাহাত্ম্যে—বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য ইত্যাদি মহিমা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ভূমা এই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নহে, আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ মহিমাশ্রিত নহে; ইহা অধোদেশে উপরিভাগে সকল দিকেই প্রতিষ্ঠিত, ভূমা ভিন্ন আর এমন কিছু নাই, যাহা ভূমার প্রতিষ্ঠান, সবই ভূমা। ভূমার দ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু নাই,—আমি অধোদেশে, আমি উপরিভাগে, আমি সকল দিকে, আমিই সব,—এই অহংকার বা অহংভাব ভূমাকে নির্দেশ করে, অতঃপর আত্মা অধোদেশে, আত্মা উপরিভাগে, আত্মা সকল দিকে, আত্মাই সব—এইরূপ আত্মাদেশ হয়, অর্থাৎ ইহা কেবল সৎস্বরূপ শুদ্ধ আত্মাকে নির্দেশ করে। সর্বত্র সবই আত্মা—এইরূপ দেখিয়া, মনন করিয়া, বিশেষ জানিয়া আত্মবিৎ আত্মবিজ্ঞান হেতু আত্মরতি (আত্মায়ই রমণকারী), আত্মক্রীড় (আত্মায়ই ক্রীড়াকারী), আত্মমৈথুন (দ্বন্দ্ব-নিরপেক্ষসুখ-ভোগী) ও আত্মানন্দ (সর্বদা সর্বপ্রকার আত্মনিমিত্ত আনন্দভোগী) হইয়া স্বরাট্ অর্থাৎ আত্মায়ই বিরাজমান হন। তখন তিনি সর্বলোকে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। প্রাণাদি পূর্ব-পূর্ব ভূমিতে

বা সোপানসমূহে যে তাবন্মাত্র-পরিচ্ছিন্ন কামচার, তাহা নিবৃত্ত হয়। সেই আত্মজ্ঞানীর পক্ষে প্রাণাদি কর্ম্মপর্য্যন্ত সবই এবং ক্রীড়াদি অন্তব্যবহার আত্মা হইতেই সংবৃত্ত হয়। তাঁহার মৃত্যু রোগ দুঃখ—কিছুই থাকে না, তিনি সবই আত্মময় দেখেন, সর্বপ্রকারে সবই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আত্মবিৎ হইয়া পূর্ণ হন।" সনৎকুমার রাগদ্বেষাদিহীন যোগ্য শিষ্য নারদকে এইরূপে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মবিদ্যার পরম্পরার উপদেশ দিয়া অবিদ্যার পরপারে পরমার্থতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সনৎকুমারের এই উপদেশ কথিত ব্রহ্মবিদ্যালাভে নামাদির উপাসনা নামাদিজপ যজ্ঞবিশেষ—অভ্যাসযোগভেদ। ইহাই উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা কঠোরসাধনাসাপেক্ষ। ইহার শেষ সোপান ভূমা—পরমতত্ত্ব।

ইহার অধিকারী উত্তমাধিকারী, তিনি ভূমার সাধনায় আত্মবিৎ বা ব্রহ্মবিৎ হন। গীতায় ভগবান্ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির বিষয়ে অর্জ্জুনকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছেন,—

"যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং—ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥"১৩,৩১।

"যখন সাধক স্থাবরজঙ্গম ভূতগণের পরস্পর পৃথগ্‌ভাব শাস্ত্রাচার্যের উপদেশানুসারে মনন করিয়া এক আত্মায় অবস্থিত দেখেন, অর্থাৎ সবই আত্মময়ভাবে প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই এক আত্মা হইতে ভূতগণের পৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তি দেখেন, তখন তিনি ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হন।" এই ব্রহ্মভাব ভূমারই পরিণাম। ব্রহ্মবিদের সংসার-ব্যবহার থাকে না, তিনি নির্মুক্ত নির্মম নিষ্কাম শান্ত। তিনি গুণাতীতের সাম্যের অধিকারী। গীতায় গুণাতীতের সাম্যের বর্ণনা এইরূপ,—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"—১৪,২৪-২৫।

"যাঁহার সুখদুঃখে সমজ্ঞান, যিনি আত্মায় অবস্থিত, যাঁহার লোষ্ট্র-শিলাস্বর্ণে তুল্যজ্ঞান, যাঁহার প্রিয়াপ্রিয় তুল্য, যিনি ধীমান্, অর্থাৎ হর্ষবিষাদ অনুভব করিয়াও ধীর, যাঁহার নিন্দাপ্রশংসা, মানঅপমান ও মিত্রপক্ষ শত্রুপক্ষ তুল্য, যিনি দেহধারণমাত্রনিমিত্ত কর্ম্ম ভিন্ন সর্বকর্ম-ত্যাগশীল, তিনিই গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন।"

বৈদিক যুগে হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠান যুগধর্ম্ম ছিল। উপনিষদের যুগ ব্রহ্মবিদ্যার যুগ। ব্রহ্মবিদ্যার কারণ ভূমা, ভূমা কঠোরসাধনাসাপেক্ষ; সে যুগে তাদৃশ কঠোর সাধনার সাধকের বা সিদ্ধের একেবারেই অসদ্‌ভাব না হইলেও বিশেষ সদ্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না, তাই তখন উপনিষদের ধর্ম্মজিজ্ঞাসু উত্তমাধিকারীর অভাব হইয়াছিল, সুতরাং ক্রমে ক্রমে ঔপনিষদ ধর্ম্মের লোপ অবশ্যম্ভাবী। কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বাদশ শ্লোকে যে হৈমবতী উমার বর্ণনা আছে, তাহা অধম অধিকারীর বোধগম্য সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিকৃতি এবং নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উত্তমাধিকারীর অভাবই এইরূপ সগুণব্রহ্মোপাসনাবিধির মূল, বোধ হয়।

ইহার পরে বৌদ্ধযুগ ও জৈনযুগ। বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলসূত্র—অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অহিংসার মূল সর্বজীবে সর্বত্র আত্মভাব; এই আত্মভাবই আত্মজ্ঞান। ইহা বৈদিক যুগের হিংসাবহুল যজ্ঞধর্ম্মের প্রতি-ঘাতমূলক। তাই জয়দেব গাহিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।"—গীতগোবিন্দ ১,১৩।

এই ধর্ম্মের ত্রিরত্নের (তিরতনের) অন্তর্ভূত 'সঙ্ঘ', উপনিষদ্‌যুগের ভূমার অঙ্কুরমাত্র,—ইহা পরিপুষ্ট হইয়া তাদৃশ মহৎ বা নিরতিশয় বহু

হইতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ ফল নির্বাণ; ইহা আর্য্যসত্যচতুষ্টয়ের পরিণাম। বুদ্ধশিষ্য সাধনা দ্বারা এই সোপান চতুষ্টয় অতিক্রম করিয়া নির্বাণলাভ করেন বা অর্হত্বপ্রাপ্ত হন। তখন তৃষ্ণাক্ষয় হেতু তিনি দুঃখাতীত বা দ্বন্দ্বাতীত হন, সংসারবন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হন। তাঁহার দিব্যচক্ষুতে বিশ্ব প্রতিভাত হয়। মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম হয় না। সনৎ-কুমারের উপদেশে যে "নাল্পে সুখমস্তি" আছে, এই "অল্প" অধিক তৃষ্ণার হেতু, তৃষ্ণা দুঃখের বীজ, এই দুঃখবীজের ক্ষয়ার্থ ভূমার উপদেশ, ভূমা সুখ। অর্হত্ব (blissful sanctification) ভূমা তত্ত্বের মত তত্ত্ববিশেষ। অর্হত্বপ্রাপ্তের অবস্থা অনেকটা আত্মজ্ঞানীরই দশার মত। অর্হত্বে পুনর্জ্জন্ম থাকে না, গীতায়ও দেবযানের যোগীরও অনাবৃত্তির অর্থাৎ জন্ম-নিবৃত্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশ আছে (গীতা ৮, ১৫)। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"বৈদান্তিক চৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নির্বাণমুক্তি, এ পিঠ ওপিঠ।"

জৈনধর্ম্মেরও মূলসূত্র—অহিংসা পরম ধর্ম্ম। জৈনেরা জিনপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী, জিনেরই উপাসক, জিনই ইঁহাদের ঈশ্বর। ইঁহাদের মতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা আর কেহই নাই। কর্ম্মফলেই জীব সুখদুঃখ ভোগ করে, জীবের সুখদুঃখদাতা আর কেহই নাই। জীবাত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, কর্ম্মের আবরণেই ইহার স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে, জিনের উপাসনায় কর্ম্মের আবরণ মুক্ত হইলে, জীবের স্বরূপ প্রকাশ পায়, জীবাত্মা পরমাত্মার দশা প্রাপ্ত হয়। এই পরমাত্মভাব আত্মজ্ঞান, গুণাতীত আত্মজ্ঞানীর অবস্থা।

অশোকাদি রাজগণের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যখন ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইতে লাগিল, তখন যে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভাব হইয়া চলিতেছিল, তাহার পুনঃপ্রচারের সুসময় সমুপস্থিত হইল। ইহা হিন্দুযুগ বা পৌরাণিকযুগ। এই যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রে—

নানা পুরাণ উপপুরাণ আগম নিগম বিরচিত হইয়াছিল। এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম সগুণব্রহ্মোপাসনা। লোক ভিন্নরুচি, এই হেতু অধিকারিভেদে নানা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা, সম্প্রদায়ভেদে উপাস্য দেবতার নানা ভেদমূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ ইহা সগুণরূপে নির্গুণেরই উপাসনা। এই যুগে নানা দেবতা ও উপদেবতার উপাসকের অভাব হইল না, কারণ, তত্ত্বতঃ না হইলেও স্থূলতঃ মূর্ত্ত দেবতার উপাসনা সহজেই সাধারণের বোধগম্য।

নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব বৈষ্ণব শাক্ত—এই তিন সম্প্রদায় প্রধান। শৈবের উপাস্য শিব ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক দেবতা। ইনি নির্গুণ দ্বন্দ্বাতীত—প্রিয়াপ্রিয়ের বা রাগদ্বেষের অধীনতামুক্ত—স্বর্গে শ্মশানে, চন্দনে ভস্মে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, অমৃতে গরলে সমদর্শী, সুখদুঃখের অতীত, তাই ইনি সৌম্যমূর্ত্তি সোমশেখর; জটাজূট ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইহার বেশভূষায় বিরাগের পরিচায়ক; ব্রহ্মবিদ্যাদি সর্ববিদ্যার আধারভূত বলিয়া, সর্ববর্ণের সমবায়রূপ শ্বেতবর্ণের ন্যায়, ইনি রজতগিরিনিভ শুভ্রমূর্ত্তি, ব্রহ্মবিৎ অহিংস, তাই গলে অহিংস কালকূট ফণিহার। এই ভাবে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতীকরূপে শিবেব উপাসনা করিলে, উপাসকের শিবত্বপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয়।

বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ সগুণ ব্রহ্ম—বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর (তাঁহার সত্তা বিশ্বরূপভাবে বিশ্বব্যাপিনী, তাই গীতায় বিশ্বরূপস্তবে) অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ গীতা ১১,৪০।

হে সর্ব (সর্বাত্মন্), তোমাকে পুরোভাগে নমস্কার করি, পৃষ্ঠভাগে নমস্কার করি, সর্ব দিকে, অর্থাৎ সর্বত্রস্থিত তোমাকে নমস্কার করি। অনন্তবীর্য অমিতবিক্রম তুমি সমস্ত জগৎ একাত্মভাবে ব্যাপ্ত করিতেছ, অতএব তুমি সর্বরূপ বা বিশ্বরূপ।”

ছান্দোগ্যে সনৎকুমারের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশও এইরূপই, তাহা নিগুর্ণের, ইহা সগুণের বিষয়।

বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রহ্লাদ এই বিষ্ণুর উপাসনায় সিদ্ধ, বৈষ্ণবভাবে তন্ময়, সর্বত্র বিষ্ণুর সত্তার উপলব্ধিতে অদ্বৈতবুদ্ধি; তাই তিনি শত্রুবুদ্ধিহীন নির্ভীক—বিষম প্রাণসংশয় সঙ্কটেও সেই বিষ্ণুভক্তবীর ভয়লেশবিহীন, সুপ্রসন্নমূর্ত্তি, নিদারুণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্ষতলেশহীনদেহ, নিরাপদ্। ধ্রুবও এই সগুণব্রহ্ম হরির ধ্যানে সিদ্ধ।

শাক্তগণ শক্তির উপাসক। এই শক্তি অনন্ত কালের শক্তি—সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী কালী। শক্তি ব্রহ্ম; সনৎকুমারও বলরূপে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন; তাই কালশক্তি কালী সগুণব্রহ্মময়ী। শাক্ত ব্রহ্মময়ীভাবে কালীর উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিলে, তাঁহার সর্বত্রই ব্রহ্মময়ীর সত্তার উপলব্ধি হয়, তখন তিনি ব্রহ্মময়ীভক্ত শাক্ত বা বিষ্ণুশক্তিবিশেষের ভক্ত শাক্ত, দ্বৈতজ্ঞানহীন, শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন, নির্ভীক। শাক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ কালীর ব্রহ্মময়ীভাবে তন্ময় হইয়া, সকল উপাসকের উপাস্য দেবতায় স্বীয় ইষ্ট দেবতা ব্রহ্মময়ীরই রূপান্তর দেখিয়াছেন; শ্যাম-শ্যামায় তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছিল না, শ্যামাই বৃন্দাবনে শ্যামরূপ! সবই এক ব্রহ্মেরই সগুণ মূর্ত্ত্যন্তর ও নামান্তর। তাই তিনি গাহিয়াছেন,—

"জেনেছি জেনেছি তারা জান তুমি ভোজের বাজী।
যে তোমারে যেমনি ভজে তাতেই তুমি হও মা রাজী॥
গাণপত্যে বলে গণেশ, যক্ষে বলে তুমি ধনেশ,
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
মগে বলে ফরা তারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা।
আল্লা আল্লা বলে তোমায়, পাঠান সৈয়দ মোগল কাজী।

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, 'মা' বিরাজে সর্বঘটে
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজী ॥
(নটবরবেশে বৃন্দাবনে) কালী হলি মা রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী ॥"

ব্রহ্মময়ীর পদাশ্রয়ে তিনি শমনশঙ্কাহীন শাক্ত, তাঁহার অনেক গানে ইহার পরিচয় আছে। শৌচাশৌচের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিপ্রয়াসী হইয়া তিনি গাহিয়াছেন,—

"শুচি অশুচিকে নিয়ে নিত্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥"

শ্যামের দোলোৎসবে হৃদয়কমলে শ্যামার দোল দেখিয়া তিনি গাহিয়াছেন,—

"হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা ॥"

ভারতবর্ষের উপাসকসম্প্রদায় অসংখ্যক। সম্প্রদায়সমূহের ধর্ম্মমতের তত্ত্বতঃ বিচার করিলে, দেখা যায়, ব্রহ্মই অধিকারিভেদে সগুণব্রহ্মরূপ—শিব, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি কোন-না-কোন দেবদেবীর সত্তা বীজরূপে নানাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের হৃদয়ে তত্তৎপ্রকার ধর্ম্মমতের সূত্রাঙ্কুর উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা তত্তদুপাসকগণের বিচারাধীন।

সনৎকুমার নারদকে ব্রহ্মবিত্থালাভের উপদেশ দিয়া চরিতার্থ করিয়াছিলেন। তাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চয় না থাকিলেও, সনৎকুমারের উপদিষ্ট বিষয়ের কিছু কিছু শুনিবার সৌভাগ্যসংযোগ আমার হইয়াছিল। শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করিতেন "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্", অর্থাৎ অল্পে সুখ নাই, ভূমাই (মহত্ত্বই) সুখ। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা তিনি করিতেন কি না, মনে হয় না। এই ভূমা তত্ত্ব তাঁহার অন্তঃকরণে যে ভাবের উন্মেষ করিয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, তাহাব কিছু কিছু খণ্ডিতরূপে তিনি কাব্যে

পরিণত করিয়া গিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অঙ্কুরাবস্থা হইতে অল্পে অল্পে বৃদ্ধিপরম্পরায় তাহার বিশ্বভারতীরূপ মহামহীরুহে পরিণতি, কবির ভূমা মন্ত্রের সাধনার প্রত্যক্ষ পরিণত বিষয়। সেই স্বল্প আশ্রমপরিসর সেই ভূমার মন্ত্রে দীক্ষিতকে প্রকৃত সুখী করিতে পারে নাই ; তাই বিশ্বভারতীর পরিসর বিশ্বব্যাপী করিতে না পারিলেও, দূরদূরান্ত দেশে বিশ্রুত করিবার নিমিত্ত উন্মনা হইয়া, তিনি দেশ-বিদেশে দূর-দূর মহাদেশখণ্ডে ইহার উদ্দেশ্য— ইহার মহত্ত্ব, বক্তৃতার মর্ম্মস্পর্শিনী বাণীতে, প্রবন্ধের চিত্তোন্মাদকর বাক্যপরম্পরায়, কথোপকথনে হৃদ্গত অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিতে মহামহামনীষিমণ্ডলে প্রাণপণ পরিশ্রমে প্রচার করিয়াছিলেন। বিশ্ব বিশ্বভারতীর আত্মীয় হইবে, বিশ্বভারতীতে একনীড় হইবে, জাতিবর্ণধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে বিশ্বভারতীর মরমী দরদী হইবে— ইহা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলগত কথা ছিল। তিনি কথায় অভিপ্রেত প্রকাশ করেন নাই, কার্য্যেই প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—

"শরদি গর্জতি ন বর্ষতি, বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ।
নীচো বদতি ন কুরুতে, ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব ॥"

"মেঘ শরৎকালে বর্ষণ করে না, গর্জনই করে ; বর্ষাকালে নিঃশব্দ হইয়া বর্ষণ করে, অর্থাৎ বর্ষাকালে বর্ষণই করে, গর্জন করে না। নীচ বলে, করে না, অর্থাৎ নীচের কথা কার্যে পরিণত হয় না ; সুজন বলেন না, করেনই, অর্থাৎ সজ্জন কার্য্যের পরিণতিতেই অভিপ্রেত প্রকাশ করেন।"

তাঁহার সেই গূঢ় অভিপ্রায় কার্য্যে কতদূর পরিণত হইয়াছে, তাহা বলিতে চাই না, তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের সহিত যাঁহারই পরিচয় হইবে, তিনিই অন্যের সিদ্ধান্তনিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই এই পরিণতির পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবেন, আশা করি।

নির্গুণ ব্রহ্ম রূপনামহীন—বিশ্ব সগুণ ব্রহ্মের রূপনামে প্রকাশ। নামরূপে ব্রহ্মোপোসনা ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম সোপান, তাই রবীন্দ্রনাথ এই নামব্রহ্মের উপাসনায়, অর্থাৎ বিকারের বা রূপের ধ্যানে ক্রমে অরূপরত্নের লাভের আশা করিয়া রূপসাগরে ডুবিয়াছিলেন, এই রূপসাগরে মজিয়া, অর্থাৎ বিশ্বরূপে তন্ময় হইয়া তিনি ভূমা তত্ত্বের সোপানে উঠিয়া বুঝিয়াছিলেন, পরিদৃশ্যমান সবই ভূমা—ব্রহ্ম কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নয়—ব্রহ্মত্ব সর্বত্রই, ইহা হইতেই আত্মোপলব্ধি, আত্মজ্ঞানী। তাই তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী এই ভাবের গানেই বাজিয়া উঠিয়াছে,—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥"

একদিন কবিকে 'নিরাকার' শব্দের তাঁহার অভিমত অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—যাহার নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। আমার বোধ হয়,—ইহাই তাঁহার রূপসাগর—বিশ্বরূপ, আর রূপসাগরের তলগত ব্রহ্মভাব সেই রত্নাকরের অরূপরতন—ভূমার পরিণাম।

এই বিশ্বরূপে তন্মনা হইয়া বিশ্বরূপের অর্চনায় বিশ্বের রূপ পূজোপচাররূপে বর্ণনা করিয়া কবি গাহিয়াছেন।

"(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীমমহিমা-মগন।
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দ রে॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে॥
বিহঙ্গগীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।

কত কত শত ভকত প্রাণ, হেরি পুলকে গাহিছে গান।
পুণ্যকিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে॥

ব্রহ্মবিৎ দ্বন্দ্বাতীত। কবির সুখদুঃখে সমভাব ছিল কি না, তাহা বলার অধিকার আমার নাই, কিন্তু বলিতে চাই, তাঁহার কাছে দুঃখের অন্যসাধারণ বিভীষিকা মূর্ত্তি ছিল না। "অভয়ং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—তিনি দুঃখের বিষক্ষয়কর এই মহামন্ত্রের সাধক ছিলেন, তাই দুঃখ ভীষণ হইলেও, তাঁহারই প্রত্যক্ষীভূত দুঃখবিহিত মঙ্গলময় পরিণাম শান্তভাবে তাঁহাকে শান্তি দিত, প্রাকৃতের ন্যায় দুঃখ তাঁহাকে অধীর করিতে পারিত না। দুঃখ তাঁহার অভীষ্টদেবতার অভীষ্ট রূপ, বিষের ঔষধ যেমন বিষ, দুঃখেব দাহ সেইরূপ দুঃখের ঔষধ, দুঃখভোগেই দুঃখ ঘুচে, দুঃখ অমৃত হয়। তাঁহার গানেই ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে,—

"দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমাবে সেথা নিবিড করে ধরিব হে॥"
"দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমাব ঘুচবে কবে।
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে, দাহন করে মারতে হবে॥
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন, জ্বলবে না আর কভু তবে॥"

দুঃখের দারুণ আঘাত তাঁহার বীণাধ্বনির ন্যায় মধুরতাময় বোধ হইত তাই তিনি প্রেমিক বাউলের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছেন,—

"এই অকূল সংসারে, দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।"

সাধক বামপ্রসাদও ব্রহ্মময়ী মায়ের ধ্যানে তন্ময় হইয়া দুঃখের ভীষণ ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া গাহিয়াছেন,—

"আমি কি দুখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুখ মা আর কত চাই॥"

উপসংহারে বক্তব্য, নারদের প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমারের যে উপদেশ, তাহাতে বুঝা যায় ব্রহ্মবিদ্যা আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিৎ আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মমৈথুন আত্মানন্দ; বোবার স্বপ্নকথার ন্যায় এইভাব অনির্বচনীয়, ইহা নিজবোধরূপ। উত্তমাধিকারীরই এই নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান; পরবর্ত্তী যুগে অধমাধিকারীর সগুণব্রহ্মোপাসনার ধারায় নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব; কিন্তু তত্ত্বতঃ সবই অভেদ। সাগরে সম্মিলিত নানা নদনদীর ন্যায় নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সেই একে অদ্বিতীয়ে সঙ্গত রুচিভেদে নানা ধর্ম্মপথ। মহিম্ন স্তবের সপ্তম শ্লোকে এই ভাবই বিবৃত হইয়াছে। —

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

"বেদত্রয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানেই মুক্তি, সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞানে, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞানেই মুক্তি, যোগশাস্ত্রে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগেই মুক্তি, তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ মকারের সাধনায়ই মুক্তি, নারদপঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণূপাসনায়ই মুক্তি—এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন পথে, এই পথ শ্রেষ্ঠ এই পথ হিতকর,—এইরূপ রুচিভেদে সাধকেরা সরল কুটিল নানা উপাসনাপথ আশ্রয় করিলেও, এক সাগরে সঙ্গত ঋজুকুটিল নদনদীর ন্যায়, হে হর! হে হরে! তুমিই (তত্তদনুষ্ঠানবিশেষে সাক্ষাদ্ভাবে বা পরম্পরায়) তত্তদুপাসকগণের এক অদ্বিতীয় গম্য বা শরণ, অর্থাৎ যিনি যে ভাবেই যাঁহারই উপাসনা করুন, তাঁহার সেই ভাবতন্ময়ী উপাসনা তোমারই, কারণ বিশ্বে তুমিই এক অদ্বিতীয়, সবই তোমারই মূর্ত্তিভেদ।

গীতায়ও ভগবান্ এই বিষয়ে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥"—৪.১১।

"হে পার্থ! যাহারা যে প্রকারে অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কাম ভাবে, আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষিত বা তদনুরূপ ফল দান করিয়া অনুগৃহীত করি। উপাসক মনুষ্যেরা সর্বপ্রকারেই, অর্থাৎ ইন্দ্রাদির উপসনায়ও আমারই ভক্তিমার্গ অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ ইন্দ্রাদির উপাসকগণও ইন্দ্রাদিরূপে আমারই উপাসনা করে।"

"বৈষ্ণব কবিতা"

বাইশে শ্রাবণ স্বর্গগত কবির তৃতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে কবির স্বর্গীয় আত্মার প্রীতিকামনায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরে সমবেতভাবে উপাসনা হয়। কোনও কারণে সেই উপাসনায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তাই মনে করিয়াছিলাম, ঐ সময়ে কবির কাব্য আলোচনা করিয়া তাঁহার স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে ভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করিব।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আমার নিভৃত কক্ষের আসনে আসিয়া বসিলাম। নিকটেই কবির কবিতাচয়ন-কাব্য "চয়নিকা" ছিল। চয়নিকা খুলিতেই বাহির হইল "বৈষ্ণবকবিতা" শীর্ষক কবিতা, মনে হইল ভালই, ইহা ভগবদিচ্ছা, ইহা আমার অভিমতবিষয়িণী কবিতা, ইহাই পড়িব। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া কবিতাটি একবার দুইবার তিনবার পড়িলাম। কবি যে ভাবে তন্ময় হইয়া কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য যথাশক্তি গ্রহণ করিয়া পড়িতে বেশ-কিছু সময় লাগিল। কবিতার তাৎপর্য যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই প্রবন্ধের বিষয়।

কবির কাব্যে কোথাও ঔদার্যের অভাব নাই, যে কবিতাই পড়া যায়, তাহারই রচনা সঙ্কীর্ণতানবচ্ছিন্ন—উদারভাবব্যঞ্জক, কিন্তু আমার মনে হইল, এই কবিতাটিতে কবির উদার হৃদয়ের উদারভাব অধিকতর উদাত্তস্বরে উদ্গীত, অতিপরিস্ফুট। বৈষ্ণব বিষ্ণুর—বিশ্বরূপ ভগবানের—ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্—ভাগবত ১-৩-২৮)। ভগবৎপ্রেম সর্ব্বভূতেই সমান—তাহাতে দ্বেষ্য প্রিয়ের বিচারণা নাই—ইহা বিশ্বজনীন প্রেম। বৈষ্ণবকবিতার ভিত্তি এই বিশ্বনাথের বিশ্বপ্রেম। কবি পরিস্ফুট করিয়া একান্তচিত্তে এই কবিতায় নির্বিশেষে ভগবানের নির্বিশেষ প্রেমের চিত্র জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চিত্ররচনার রহস্য সর্বতোভাবে গ্রহণ করার অধিকার না থাকিলেও, ভাবিলাম যতক্ষণ এই নির্বিশেষ ভাব আমার মনকে অধিকার করিয়া

রাখিয়াছিল, ততক্ষণই মনে চিন্তান্তরের স্থান ছিল না, মন বিশুদ্ধই ছিল, অতএব ভগবদ্‌বিষয়ে চিত্তের একান্ত অভিনিবেশ হেতু ততক্ষণই এই মর্ত্ত্যজীবন সার্থক, ততক্ষণই সুদিন। তাই কবিবাণী,—

"যদচ্যুতকথালাপরসপীযূষবর্জ্জিতম্।
তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্॥—শব্দার্থচিন্তামণি।"

যেদিন ভগবদ্‌বিষয়ের আলোচনারূপ রসসুধাবর্জিত অর্থাৎ যেদিন ভগবানের কথার চর্চ্চা হয় না, সেই দিনই বস্তুতঃ দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে।

আমার বিশ্বাস, কবি বৈষ্ণবমতের পক্ষপাতী ছিলেন। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" ইহার বিশিষ্ট নিদর্শন থাকিলেও, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীও তাঁহার বিশেষ মনোরঞ্জিনী ও প্রীতিদায়িনী ছিল, ইহারও সুপ্রকট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই মনে হয়, তত্ত্বতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভগবৎপ্রেমে তন্ময় কবিপ্রতিভা "বৈষ্ণবকবিতা"-রূপে কবির কবিতায় মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে।

এই কবিতার প্রারম্ভপঙ্‌ক্তিতে কবির জিজ্ঞাসা,—

"শুধু বৈষ্ণবের তরে বৈকুণ্ঠের গান?"

ইহার সঙ্কীর্ণতাহীন সদুত্তর কবি এই কবিতার পরবর্ত্তী কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে সুস্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন। সাধারণে মনে করে, বৈষ্ণবের গান কেবল বৈকুণ্ঠে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণেরই গীতিমালা; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বৈষ্ণব জ্ঞাননেত্রে বিশদভাবেই দেখিতে পান, বৈকুণ্ঠনাথের বৈকুণ্ঠধাম সর্ব্বত্রই—ত্রিভুবনে; ত্রিভুবননাথ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে—বিশ্বরূপ-রূপে—ব্রহ্মরূপে বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়। তাই আর্য ঋষি গাহিয়াছেন,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥
—ঋগ্বেদ ১-২২-২০।

—বিদ্বানেরা বিষ্ণুসম্বন্ধী উৎকৃষ্ট শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্বর্গস্থান শাস্ত্রদৃষ্টিতে সর্বদা দেখেন; যেমন আকাশে সর্বত্র প্রসৃত চক্ষু নিরোধাভাবে বিশদভাবে দেখে। বিষ্ণুর শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্বর্গস্থান—বৈকুণ্ঠধাম; শাস্ত্রজ্ঞ উদার পণ্ডিতেরা জ্ঞাননেত্রে সেই ধাম সর্বত্রই দেখেন, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌পুরুষ ভগবানের ধাম যে বিশ্বস্বরূপ আধার, তাহাই স্বর্গস্থান—তাহাই বৈকুণ্ঠধাম; জ্ঞানী বৈষ্ণবপণ্ডিত আকাশে প্রসৃত চক্ষুর ন্যায় সেই ধাম বাধাভাবে সর্বত্রই পরিস্ফুট দেখিতে পান। গীতায়ও ভগবদুক্তি :—

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। গীতা ৯-৪।

—কারণভূত অব্যক্তমূর্ত্তি আমি এই দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছি।

তাই বলি, আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত—আব্রহ্মরেণুকণাপর্যন্ত নিখিল জগৎ বৈকুণ্ঠনাথের বৈকুণ্ঠধাম। যাঁহার সেই জ্ঞানচক্ষু আছে, তিনিই বলিবেন,—

"যে পেয়েছে আঁখি, দেখিতে কি বাকি, কিছু আর তার আছে?"

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কবিও গাহিয়াছেন,—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।"

—ধর্মসঙ্গীত, ৬৭।

তাই কবির জিজ্ঞাসা—পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন বৃন্দাবনগাথা—এই নিরন্তর প্রবহমাণ ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গীতের রসধারা কি শুধু দেবতারই তপ্ত প্রেমতৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য?—নয়। কখনই নয়! বিশ্বপিতার বিশ্বলীলার বিশ্বব্যাপিনী অমৃতরসধারার পানে প্রতিদিবসের প্রতিরজনীর তপ্ত প্রেমতৃষ্ণা মিটাইবার অধিকারী নির্বিশেষে দীন নরনারী সকলেই! কবিতাপঙ্‌ক্তিতে কবির বাণী ;—

…"এ কি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীতরস-ধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতিদিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?"

সাধারণভাবে সকলেই অধিকারী বলিয়া কবি পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, বিশদভাবে তাহা অধিকারিনির্বাচনের কথা, অর্থাৎ সকলেই অধিকারী সত্য, কিন্তু সে অধিকার যে বুঝিযাছে, তাহার কাছে তাহা ধ্রুব সত্য, সে সেই অধিকার সম্পূর্ণ অধিকাব করিয়া বসিয়াছে, নির্জনে ভগবানের লীলাগীতেব নিরন্তর বসধাবাব আস্বাদনে সে পরিতৃপ্ত। সেই বিশিষ্ট অধিকারী ভক্ত,—শুধু ভক্তের দেবতা তিনি আর ভক্ত, মধ্যে আর কাহারও সত্তার বাধা নাই। কবিতায় কবিব বর্ণনা, --

"এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে ,—
দাঁড়ায়ে বাহিরে দ্বারে মোরা নরনাবী
উৎসুক শ্রবণ পাতি, শুনি যদি তারি
কয়েকটি তান,—দূব হ'তে তাই শুনে'

*　　*　　*

অন্তব পুলকি উঠে ,　　"

এই অন্তরের অন্তর্গত পুলকে বাহ্য বিশ্বেব জড়েও পুলক উঠে, জড জড থাকে না, পুলকস্পর্শে পুলকিত সজীব হইয়া মধুর হইয়া উঠে, সব মধুময় হয়—বনচ্ছায়ায় প্রবাহিণী নদী, কদম্বকুসুমটি পযন্ত পুলকিত সজীব হয়, মধুময় দেখায়। এই প্রেমাতুর তানে বিভোর হইয়া জীবনযাত্রায় প্রেমের আদি উৎসের অনুসন্ধিৎসু কবি উৎসের সন্ধান পাইযা গাহিয়াছেন,—

"সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা ;"

ধরার সঙ্গিনীকেই ধরায় প্রেমের উৎসরূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। পরে কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বৈষ্ণবসাহিত্যে পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির যে বিচিত্র চিত্র বৈষ্ণবকবিগণ মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর সলীলচ্ছন্দে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কোথায় পাইয়াছেন?—কে তাহা অঙ্কিত করিতে শিখাইয়াছে?—এই জিজ্ঞাস্যের সমাধান জিজ্ঞাসু কবির লেখনীমুখ হইতে কতিপয় কবিতাপঙ্ক্তিতেই নিঃসৃত হইয়াছে ;—

"সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব-কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-নয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি? এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ ; কার
আঁখি হতে? আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে? তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন?"

প্রশ্নের সমাধানে বৈষ্ণবকবির অন্তর্নিহিত কথা ব্যক্ত করিয়া কবি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন—হে বৈষ্ণব কবি, এই প্রেমচিত্রের আকর—এই চিত্রাঙ্কণের শিক্ষয়িত্রী তোমার সেই ধরার সঙ্গিনী। নারীহৃদয়ে সঞ্চিত মৌনী ভালবাসার ভাষাই তোমার পদাবলীতে প্রণয়গীতির সুললিত ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বার্থ চরিতার্থ করিয়াছে ; সে সঙ্গীতে সঙ্গিনীর যে অধিকার তাহাতে তাহাকে কি চিরদিনই বঞ্চিত করিয়া রাখিবে ?—তাহা হইবে না ; তুমি একথা অন্তরে চিরদিন নিগূঢ় করিয়া রাখিয়াছিলে, আমি, হে কবি, কবি-হৃদয় দিয়া কবির হৃদয় বুঝিয়া তোমার সেই রহস্য উদ্ভিন্ন করিয়া দিলাম, প্রণয়গীতিহার নীরব ভাষায় যে গাঁথিতে শিখাইয়াছে, শিক্ষয়িত্রী সেই সঙ্গিনীকে আব বঞ্চিত করা কবিকর্ম নয়। এই সত্য অধিকারদানে অবিনয় নাই, কবি তুমি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবে।

ইহার পরে অঙ্কিত চিত্র বড় মনোমোহন—দেবতা-পতিদেবতার মধুবভাবের ছবি। যে হৃদয়ে মধুরভাব কামগন্ধলেশহীন মাধুর্য আসন বিছাইয়া বসিয়াছে, সে হৃদয়ে দেবতার আসন, আর প্রিয়জনের আসন অভিন্ন। নরনারীর মিলনমেলায় যে প্রেমের গীতিহার গাঁথা হইয়াছে, তাহা দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট হউক, অথবা প্রিয়ের কণ্ঠে পরিহিত হউক,—এ দুইই একই কথা, মধুরভাবে কোন ইতরবিশেষ নাই, মাধুর্যের মেলায় যাহা দেবতার, তাহাই প্রিয়ের, যাহা প্রিয়ের, তাহাই দেবতার নৈবেদ্য। দেবতা-প্রিয়ের এমন একাত্মতা আর কোন ভাবেই নাই। হে বৈষ্ণবকবি, তুমি যে গীতিহার গাঁথিয়া দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছ, সে ভাবে ভাবিতে পার নাই, যে দেবতাবোধে প্রিয়জনকে, প্রিয়জ্ঞানে দেবতাকে উপহার দেয়, তাহার দ্বৈতহীন বুদ্ধিতে উভয়ই অভেদ, তুমি প্রিয়জনের কণ্ঠে প্রদত্তগীতিহার নিজেরই ভাবিয়া দেবতাকে দিয়া চরিতার্থ হইয়াছ, মূলের আদর স্বার্থান্ধ তোমার মনে

হয় নাই। তোমার প্রণয় শ্যামিকায় শ্যাম স্বর্ণ, তোমার সঙ্গিনীর প্রণয় বিশুদ্ধ জাম্বুনদ হেম! তোমার উৎসর্গে দ্বৈত, সঙ্গিনীর উৎসর্গে অদ্বৈত—মাধুর্যে দেবতা প্রিয় একই। তাই কবি মাধুর্যের মোহে গাহিয়াছেন,—

"আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারীমিলন-মেলায় ;
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই,
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

বৈষ্ণবকবির গাঁথা এই প্রণয়গীতির উপহার নিরন্তর বৈকুণ্ঠনাথের চরণে উৎসৃষ্ট হইতেছে। মিলনে আত্মহারা পিপাসু নরনারী নির্বিচারে এত গীতি, এত ভাবোচ্ছ্বসিত প্রীতি, এত ছন্দ, এত মধুরতা উপভোগার্থ হৃদয়কুণ্ডে ভরিয়া লইয়া চরিতার্থ হইতেছে। হে সাধু পণ্ডিত, তুমি ইহাতে দোষারোপ করিয়া রোষপ্রকাশ করিতে চাও, কর, কিন্তু তাহা একেবারেই ব্যর্থ। তুমি জান না, এই উপহারসম্ভারের দেবতা বৈকুণ্ঠ-নাথ-বিশ্বনাথ ; তিনি প্রেমময়, প্রেমের অধিকারে, প্রেমের চক্ষে দ্বেষ্য-প্রিয়ের স্থান নাই—সকলেই ভক্ত—সকলেই প্রিয়। ভক্তের গীতি-উপহার জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সেই ভক্তবৎসলের পরম প্রিয় নৈবেদ্য। ঐ দেখ, দেবতার প্রসাদপ্রসন্ন স্নিগ্ধ নেত্রে ভক্তের প্রতি স্নেহের—ভক্তবৎসলতার হাস্যমাধুরী পরিস্ফুট! তোমার সরোষদোষদৃষ্টিতে তুমিই দূষিত হইতেছ, নির্বিশেষে নির্বিশেষভাবে সমাহিত হইলে, তোমারও অন্তর-বৈরাগীর

সে দৃষ্টি আর থাকিবে না। কবিতার শেষ কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে কবি ইহারই বর্ণনা করিয়া সাম্যের গীতি গাহিয়াছেন;—

"সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ঐ অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন ব'সে।"

"পূজার সাজ"

"O Life, without thy chequer'd scene
Of right and wrong, of weal and woe,
Success and failure, could a ground
For magnanimity be found ?"

জীবনে সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় ওতপ্রোত—নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরন্তর দুঃখ কাহারও হয় না বা থাকে না ; নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারের পথে ইহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী। জীবনে সুখদুঃখের এই পর্যায় সংসারীকে সংসারের পথে স্থির-ধীর হইয়া চলিবার শক্তি দেয়—সংসারী জীবনযাত্রায় পথভ্রষ্ট হয় না। মানবজীবনে সুখদুঃখের এই ভাবাভাব গুণাগুণের আলোছায়ার চিত্র পরিস্ফুট করিয়া অঙ্কিত করে। মহাভারতের পটে কুরুপাণ্ডবের চরিত্র ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। কোন ধর্মশাস্ত্রেই এরূপ চিত্রের অভাব নাই ; শাস্ত্রকার সমাজের হিত-কামনায়ই এই চিত্র শাস্ত্রগত কবিয়া রাখিয়াছেন।

প্রতিভাসম্পন্ন কবি সমাজের শিরোভূষণ—সৎপথপ্রদর্শক নেতা। যে সমাজে তাদৃশ কবির আবির্ভাব হয় নাই, সে সমাজ বিধাতার অভিশপ্ত, তাহার সর্বপ্রকার উন্নতির পথ এক-প্রকার অবরুদ্ধই। সুখ-দুঃখের বিশেষ বিশেষ সামাজিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবান্ কবি বিচারপূর্বক কাব্যে কবিতায় যে চিত্রের বর্ণনা করেন, তাহাই সমাজের আদর্শস্বরূপ, তাহাই সংসারীকে গৃহস্থধর্ম্ম-পরিচালনার শক্তি দেয়, উৎসাহিত করে।

পূজার উৎসব উপলক্ষ্যে "পূজার সাজ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে গৃহিচরিত্রের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা গৃহস্থের সুখ-দুঃখের অবস্থা-

বিশেষেরই বর্ণনা , এই বর্ণিত বিষয়ের অবলম্বন গৃহী ও গৃহিণী ; বস্তুতঃ, গৃহি-গৃহিণী লইয়াই গৃহস্থাশ্রমের প্রতিষ্ঠা।

সম্পন্ন বা বিপন্ন গৃহীকে অবস্থাভেদে সংসারপথে কিরূপে চলিতে হইবে, তাহা সংসারীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। কি দৈনিক জীবন-যাত্রায়, কি উৎসবকালে, অবস্থানুসারে গৃহস্থতা রক্ষা করিয়া গৃহস্থকে কি উপায়ে সংসার-ধর্ম রক্ষা করিতে হয়, এই কবিতায় কবি তাহারই শিক্ষা দিয়াছেন। গৃহী ও গৃহিণীর অবস্থানুসারে গৃহকর্মের সুব্যবস্থায় গার্হস্থ্য সম্পন্ন হয়, অব্যবস্থায় বিপন্ন হয়, তাহা দারিদ্র্যেও যেমন সম্পন্ন বিপন্ন, ঐশ্বর্য্যেও তেমনি তত্তদবস্থাপন্ন। এই সম্পত্তি ও বিপত্তির মূল গৃহস্থ-দম্পতির সকল অবস্থায়ই পরস্পর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠবুদ্ধি ও তদনুবর্ত্তী প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের "পূজার সাজ" কবিতায় উল্লিখিত গৃহস্থোচিত বুদ্ধি ও প্রকৃতির পরিচযই কবিকর্ম। আশ্বিনে পূজার সময নিকট হইয়াছে, নগরে গ্রামে পল্লীতে পূজাব বাদ্যেব আনন্দরোল উঠিযাছে চারিদিকে সকলেই আনন্দের কোলাহলে মাতিয়াছে, শিশুদের ত' কথাই নাই, তরল শিশুহৃদয় ত আগেই নাচিবে। কিন্তু শিশুর আনন্দ কিসে?—বৎসরান্তে আনন্দময়ী জগন্মাতা আসিতেছেন, তাঁরই দর্শনের আনন্দ? না, তাহা গৌণ, পূজায় অভিমত পূজার সাজে আনন্দে সাজিবে—ইহাই শিশুর মুখ্য আনন্দ। কবি এই উপলক্ষ্য করিয়া দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবারের অনুকূল প্রতিকূল মনোবৃত্তির বর্ণনার রঙ ফলাইয়া "পূজার সাজ" কবিতা অঙ্কিত করিয়াছেন। এক্ষণে কবিতার পাত্রগণের চরিত্র-সমালোচনা করিয়া তাহা দেখাইব।

পিতা বৎসর বৎসর পূজায় বালকবালিকাদিগের জন্য মূল্যবান্ অভিমত বসন-ভূষণ আনিয়া দেন, এবার দৈবদুর্বিপাকে তাঁহার অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাই তিনি কিছু বিমর্ষ, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া এবার সাদাসিদা কাপড় জামা কিনিয়া শিশুদের অজ্ঞাতভাবে গৃহিণীকে

আনিয়া দিয়াছেন। পিতা গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, বালকেরা কৌতূহলী হইয়া পোষাকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা বলিলেন,—"আছে আছে, তোদের মায়ের কাছে আছে, পূজার দিনে দেখতে পাবি।" তরল-প্রকৃতি শিশুদের সবুর সহিল না, তখনই তাহারা দৌড়িয়া মায়ের কাছে গিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, আমাদের জন্য বাবা এবার কি পোশাক এনেছেন? একটি বার দেখাও না, মা!" ব্যগ্রতা দেখিয়া মা একটু হাসিয়া পোশাক আনিয়া শিশুদিগকে দেখাইলেন, মধু বিধু উভয়েই দেখিল,—দুটী ছিটের জামা মাত্র! পূর্ব-পূর্ব বারের কথা মনে করিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল কি!—আর মা দেখাইলেন কি!—কোথায় শিশুর আনন্দের পরিচ্ছদ—জরির টুপি, সাটিনের ফুলকাটা পোশাক, আর কোথায় সূতার জঘন্য ছিটের জামা দু'টী। মধুর ভাল লাগিল না, বলিল, "আর নেই!" মা বলিলেন,—"আছে, এক জোড়া ধুতি আর চাদর।" ইহাতেও মধুর মন উঠিল না, সে কি ভাবিয়াছিল, কি হইল! রাগে আগুন হইয়া মধু অনাদরে কাপড় চাদর ধূলায় ফিলিয়া দিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"রায় বাবুদের গুপি জরির টুপি, ফুলকাটা সাটিনের জামা পরেছে, আমি এ ছাই ছিটের জামা, ধুতি চাদর চাই না!"

মধু পিতার অবস্থা বুঝিল না, মা ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, বুঝাইয়া বলিলে মধু বুঝিবে, তাই তিনি মধুর ঘৃণার কথায় কিছু ব্যথিত হইয়াও বলিলেন,—

"...মধু ছি ছি কেন কাঁদ মিছামিছি
গরীব যে তোমাদের বাপ!
এবার হয় নি ধান কত গেছে লোকসান
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ!
তবু দেখ বহু ক্লেশে তোমাদের ভালবেসে
সাধ্যমত এনেছেন কিনে,

সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির পরে
এই শিক্ষা হল এতদিনে !"

বিধু শান্ত সুবোধ, মায়ের মনঃক্ষোভ তাহার অন্তরে আঘাত করিল ; মায়ের সান্ত্বনার কথায় পিতার অবস্থা সে বেশ বুঝিল,—"মা, এই কাপড় চাদর জামা আমার বেশ পছন্দ হ'য়েছে, আমি পূজায় প'রবো।" বিধুর কথায় মধু আরও রাগিয়া উঠিল, সে স্থির থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে রায় বাবুদের বাড়ীতে গিয়া দালানের এক কোণে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাবু তখন প্রতিমা সাজাইতেছিলেন, বড় ব্যস্ত, তথাপি মধুকে ম্লান মুখে এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে মধু, কি হয়েছে ! তোর মুখটা শুকনো কেন ?" রায় বাবুর স্নেহের কথায় মধু কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে সব কথাই বলিল। বাবু সবই বুঝিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এতে তোর দুঃখ কেন ?"—এই বলিয়াই ছেলেকে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন,—"গুপি, তোর সাটিনের জামাটা মধুকে দে।" পিতার কথায় গুপি তখনি জামা খুলিয়া মধুকে দিল। জামা পরিয়া মধু হাসিতে হাসিতে অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া আত্মীয়স্বজনকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল,—"বিধু ছিটের জামা পরেছে, আমার গায়ে সাটিনের জামা, চেয়ে দেখ !"

মা চুপ করিয়াই ছিলেন, কিন্তু মধুর এই অহঙ্কারের কথা আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; যে পুত্র পিতা-মাতার অবস্থা বুঝিল না, তিনি সেইরূপ কুপুত্রের জননী হইয়াছেন, ভাবিয়া নিদারুণ ক্ষোভে তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল ; ধিক্কারের সহিত কপালে করাঘাত করিয়া মনস্বিনী দরিদ্রের গৃহিণী বলিলেন,—

"হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ
কারো কাছে পাতি নাই হাত !

তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা ল'য়ে অবহেলে
অহঙ্কার কর ধেয়ে ধেয়ে!
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশী দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে!
আয় বিধু আয় বুকে চুমো খাই চাঁদমুখে
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো!
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো!

এইখানেই "পূজার সাজ" এর সমাপ্তি, কবিরও কবিকর্মের পূর্ণ-পরিণতিতে অবসান। পিতার মুখে দুই একটি অন্তঃক্ষোভের কথা ফুটাইয়া কবি নীরব! এই মৌন অশোভন নহে, ইহাই জননীর মুখ ফুটাইয়া দিয়া দম্পতির সেই মনঃক্ষোভের উচ্ছ্বসিত কথা এক করিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, তাই পিতার মৌন ভালই।

মধু অবহেলা করিয়া দরিদ্র পিতার স্নেহের ধুতি চাদর ধুলায় ফেলিয়া দিলে, মা পুত্রকে বুঝাইযা যে বিষাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দুঃখে লজ্জায় তিনি মধুকে পুত্র বলিযা কোলে স্থান দিবার যোগ্য মনে করেন নাই; মধুর ভিক্ষা-করা সাটিনের ফুলকাটা জামা ধিক্কারের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন। বিধু পিতার দুঃখে সমদুঃখী, দরিদ্র পিতার প্রদত্ত সামান্য পূজার সাজ অসামান্য বলিয়া পছন্দ করিয়া পরিয়াছে, পিতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, তাই মনস্বিনী মায়ের কোল সেই যোগ্য পুত্রের যোগ্য স্থান।

যে কতিপয় পঙ্‌ক্তিতে কবি দরিদ্র স্বামীর প্রতি পত্নীর যে মনোবৃত্তির রেখাপাত করিয়াছেন, তাহা স্বল্পের মধ্যেই প্রত্যেক গৃহিণীর শিক্ষার সার কথা। সর্বাবস্থায়ই পতি পত্নীর অনুগমনীয়, তাহাতে সম্পত্তির বিপত্তির, দারিদ্র্যের ধনবত্তার বিচারণা নাই। দরিদ্রের সহধর্ম্মিণী

মনস্বিনী পত্নীর চরিত্রাঙ্কণে কবি দম্পতি-ধর্মের এই চিরন্তন আদর্শ মনে রাখিয়াই দীন গৃহিণীর চিত্র আঁকিয়াছেন। বন-গমনে রামচন্দ্র অত্রি-তপোবনে উপস্থিত হইলে, অত্রি-পত্নী পতিব্রতা অনসূয়া সতী সীতাকে সতীধর্মে এই উপদেশই দিয়াছিলেন :—

"নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা, যদি বাশুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।—
রামায়ণ ২,১১,৭,২৩,—২৫ শ্লোক।

এই ধনবর্জিত অনুকূল পতির আর্যপ্রকৃতি পতিরতা পত্নীর চিত্র "পূজার সাজ"-এ লিখিত হইয়াছে।

রায়বাবুর চরিত্র-কথা স্বল্প হইলেও, কবি লেখনীর সঙ্কীর্ণ রেখাপাতে তাহাই অনল্প করিয়াই ছবিতে তুলিয়াছেন। প্রায় দেখা যায়, সংসারে পরস্পর-মিলনের প্রধান অন্তরায় সাংসারিক অবস্থা, অর্থাৎ মিলনের মূল অবস্থা সাম্য—দরিদ্রের বন্ধু দরিদ্রই, নির্ধনের ধনবান্ বন্ধুর একেবারে অসম্ভাব না হইলেও তাদৃশ উদার-চরিত ধনী সুহৃদের সদ্ভাব নিতান্ত বিরল। মধুর মলিন মুখ, কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, রায় বাবুর মনোযোগ আকর্ষণ কবিয়াছিল, তিনি পুত্রেব মতই পবিবারের অঙ্গীভূত ভাবিয়াই প্রতীকাবে মধুর ম্লান মুখ হাস্য-বিকসিত কবিয়াছিলেন। ইহাতে ধনি-দরিদ্রেব বৈষম্যের সীমারেখা ছিল না, ইহা যেমন স্বার্থ-ত্যাগে পবার্থপরতার পরিচয়, তেমনি আভিজাত্যে প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অভিজাত বংশই উদারপ্রকৃতি। সংসাবে ধনী দরিদ্রের এইরূপ সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হয়, সংসার ততই সুখময় হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—

"হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই।" —বিদ্যাপতি।

শিশু গুপির চরিত্র উপসংহারে বক্তব্য বিষয়। তাহার শিশু-চরিত্রের যাহা-কিছু পরিণতি হইয়াছে, তাহা তাদৃশ ধনীর পুত্রের প্রকৃতিতে প্রকৃতই লক্ষ্যের বিষয়; মধু ও গুপি উভয়ই তরলপ্রকৃতি শিশুমাত্র। পূজার সাজে কাহারও আনন্দের ন্যূনাধিক্য নাই, কিন্তু তথাপি পিতার আদেশমাত্রেই শিশু গুপি কোন কথা না বলিয়াই, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশপালনে প্রীতিই অনুভব করিল। শিশুর এই পিতৃভক্তি, পরার্থপরতায় স্বার্থত্যাগ, বস্তুতঃই চিত্তাকর্ষক। আভিজাত্যের ইহাই পরিচয়, ইহাই প্রকৃতি।

"পূজার সাজ" কবিতা ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার প্রত্যেক পাত্রে কবির নিপুণ তুলিকার যে রেখাপাত হইয়াছে, তাহা সমালোচনার বর্ণে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাফল্য সুধীর বিচার্য।

"কাঙালিনী"

হিন্দুর বারো মাসে তের পার্বণ—হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুর বৎসর, হিন্দুর জীবন, পার্বণের ক্রমিক অনুষ্ঠান-জন্য আনন্দের ধারায় অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে নানা উৎসবের বিধান করিয়াছেন। পর্বোপলক্ষ্যে দেবতার অর্চনা-ভোগরাগাদি-জন্য পবিত্র আনন্দ-উপভোগ হয় এবং কিয়ৎকাল সংসারের চিন্তার অবসর থাকে না বলিয়া, দেবতা এই আনন্দধারার প্রথম উৎস , পক্ষান্তরে, দরিদ্রসেবা উৎসবের অঙ্গবিশেষ, ইহার অভাবে উৎসবের আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হয় না—উৎসব যেন অঙ্গহীন হইয়া নিরানন্দ নীরস হইয়া উঠে। এই হেতু সেবা-ধর্ম্ম উৎসবের আনন্দ-ধারার অন্যতম উৎস। পর্বদিনে দেবতার অধিষ্ঠানে সংসার আনন্দে ভরিয়া উঠে, সকলেরই মুখ উৎসবের আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠে, যেন তাহারা তখন ইহলোকের শোকদুঃখময় সংসারের কথা স্বপ্নকথার মতই বিস্মৃত হইয়া সুখময় স্বর্গলোকের অধিবাসী হইয়াছে, মনে করে ; আহূত অনাহূত রবাহূতেব কলকোলাহলে উৎসব-মণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠে, ক্ষুৎপীড়িত খাদ্যে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, বস্ত্রহীন নববস্ত্রে নগ্নতা দূর করিয়া লজ্জা নিবারণ করে, সর্বত্রই 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব। ফলতঃ উৎসবকর্ত্তা উৎসবদিনে পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা, দীনের দীনবন্ধু। ইহা পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা। কেবল-মাত্র স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে তাঁহার যে হৃদয় অবরুদ্ধ ছিল, উৎসবের দিনে দরিদ্রেব দুঃখে সহানুভূতি-জন্য পরার্থ-পরতার আঘাতে তাহা অবরোধমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট নবজন্ম লাভ করে। উৎসবের অনুষ্ঠানের পরম্পরায় দাতার মন এইরূপে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, একেবারে স্বার্থান্ধকূপে অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে

না। সুতরাং, একদিকে পুণ্য দেবার্চনার ফলে মন যেমন তদেকান্ত হইয়া নির্মল পরিপূত ও পুণ্যপ্রবণ হয়, পক্ষান্তরে, তেমনি সেবাধর্মে আরতিতে সকলের মনের ছন্দে যুক্ত হইয়া স্বার্থান্ধতা হইতে মুক্তিলাভ করে। তাই মনে হয়, প্রত্যক্ষভাবে ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়া সমাজের হিতকামী মনস্বী শাস্ত্রকার পরোক্ষভাবে কর্মমার্গে কর্মযোগে ক্রমশঃ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির পথে সংসারীকে উন্নীত করিয়া জীবন্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উৎসবের পক্ষদ্বয়সত্ত্বে, যে উৎসবে কেবল দেবার্চনাই উদ্দেশ্য সে উৎসবে দেবারাধনা যোড়শোপচারে হইলেও, তাহা অঙ্গহীন প্রাণহীন নিতান্ত নিষ্ফল। প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় উৎসবকর্ত্তার প্রাণে দেবতার প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার প্রাণে পুণ্য দৈবশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই দৈবী শক্তির প্রভাবে তাঁহার পরার্থপর মন দরিদ্রের সেবাধর্মে অভিমুখ হয়; তাই উৎসবমাত্রে দেবতাকে নিবেদিত নৈবেদ্যের বা প্রসাদের বিতরণের ব্যবস্থা; যজ্ঞানুষ্ঠানে যাহা কিছু সামগ্রীসম্ভার, তৎসমুদয়ই দেবতার প্রসাদ, তাহা সাধারণেরই সেবাদ্রব্য, কেবল ব্যক্তি-বিশেষের বা পরিবার-বিশেষের ভোজ্য নহে। তাই গীতায় ভগবানের উক্তি ;—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"

গীতা—৩-১৩।

"যাঁহারা দেবযজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন; যাঁহারা আপনার জন্য পাক করেন, তাঁহারা নিশ্চিতই পাপ অর্থাৎ পাপময় অন্নকবল ভক্ষণ করেন।"

হিন্দুর সেই বার মাসে তের পার্বণের মধ্যে শারদ-পার্বণ বা দুর্গোৎসব প্রধান। আনন্দময়ীর আগমনে দেশ আনন্দে ভরিয়া যায়—

এমন দেশভরা আনন্দের উৎসব হিন্দুর আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই শারোদৎসবের বিষয় লইয়া লিখিয়াছেন,—

"আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে, দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

কাঙালিনী মেয়ে ভোরে উঠিয়াই আনন্দময়ীর আগমনে উৎসবের আনন্দ-কোলাহল শুনিয়াছে, বাদ্যধ্বনিতে বংশীরবে উৎসবমণ্ডপ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, নানাবর্ণের হেমমণিমুক্তাখচিত নব নব পরিচ্ছদে সজ্জিত শিশুরা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছে,—কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে—সকলেই আনন্দের দিনে আনন্দে ভরপূর, তাই কাঙালিনী মেয়ে সেই আনন্দের ভাগিনী হইবার আশায়, নিজের নিরানন্দ কুটীর হইতে ধনীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কৈ কাঙালিনীর সে আশা পূরিল কৈ। তাহার মা নাই, বাপ নাই, ভাই বন্ধু কেহই নাই—সংসারে সে নিতান্ত নিরাশ্রয়া, একাকিনী। কেহই ত তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া স্নেহের বাক্যে ডাকিতেছে না—কেহই ত কন্যার স্নেহে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার জীর্ণ মলিন চীরখণ্ডের পরিবর্তে নূতন বস্ত্র পরিতে দিতেছে না। সকলেই নিজের আনন্দে বিভোর, অন্নাভাবে নিতান্ত শীর্ণ তাহার মলিনমুখে দৃষ্টিপাত করিলে কি তাহাদের কাহারও আনন্দধারা ক্ষীণশুষ্ক হইবে? সে যেন এই আনন্দ-ধারার কেহই নহে,—সে পৃথক্ বিধাতার পৃথক্ সৃষ্টি! তাই তাহার চক্ষু বিষাদের অশ্রুধারায় অভিষিক্ত। সে শুনিয়াছে জগজ্জননী আনন্দময়ী আসিয়াছেন—সকলেই সেই জননীর সন্তান, সকলেই সেই আনন্দের সমান অধিকারী,—কৈ সে ত মা পাইল না, তাহার ভাগ্যে ত আনন্দ-ধারার বিন্দুমাত্রেরও আস্বাদন ঘটিল না! তবে কি এ মা তাহার মা নয়! সে কি দুয়ারেই অবহেলার পাত্রী হইয়াই দাঁড়াইয়া থাকিবে! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গলাগলি ধরিয়া আঙিনায় নাচিতেছে,

গাহিতেছে, হাসিতেছে, কাঙালিনী নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া সস্পৃহনেত্রে দেখিতেছে, ভাবিতেছে সে কি তাহাদের কেহই নয়! জননী আদর করিয়া সন্তানকে নববস্ত্র পরাইয়া দিয়াছেন, তাহার কি কোন জননীর স্নেহে এতটুকু অধিকার নাই, যিনি তাঁহার নববস্ত্রে তাহার নগ্নতা দূর করেন! হায়, ভিতরে আনন্দের উচ্ছ্বসিত কোলাহল হাসিরাশি বাঁশীর স্বরলহরী, বাহিরে দুয়ারে দণ্ডায়মানা অবজ্ঞাতা বিষাদাশ্রুসিক্তা মলিনমুখী অনাথা কাঙালিনী! দৃশ্য বড়ই করুণ!

সহানুভূতির সহিত কাঙালিনীর বিষাদভরা মনের কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়া মনস্বী কবি বলিয়াছেন—সংসারে দুঃখদগ্ধ অনেক কাঙালিনী আছে, কিন্তু হায়, উৎসবের দিনে ধনীর দ্বারে তাহাদের স্থান নাই, অন্ন-বস্ত্র মিলে না, ধনীর স্নেহ-মমতায় তাহাদের কণামাত্র অংশ নাই, উৎসবের আনন্দে তাহাদের অধিকার নাই! যে-উৎসব এইরূপ সর্বপ্রকারেই ধনীরই উৎসব, সেবাধর্মবর্জিত অঙ্গহীন, সে উৎসব—কেবল নামযজ্ঞ বা নাম-মাত্রে উৎসব।" তাই কবিতার সমাপ্তি-শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি ;—

"অনাথা ছেলেরে কোলে নিবি জননীরা আয় তবে সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঙ্গল-কলস!"

"পূজার সাজ" ও "কাঙালিনী"—উভয়েরই উপলক্ষ্য শারদীয় উৎসব। একের অবলম্বন—দরিদ্র ও ধনী গৃহস্থ, দ্বিতীয়ের ধনী ও কাঙালিনী। উভয়স্থলেই কবির অভিপ্রায় সামাজিক শিক্ষা। একে গৃহস্থদ্বয়ের পরস্পর চরিত্রচিত্র, দ্বিতীয়ে দরিদ্রের প্রতি ধনীর কর্ত্তব্য—সেবাধর্মের চিত্র।

রবীন্দ্রনাথের বংশলতায় অসঙ্গতিমূলক ভ্রম

Calcutta Municipal Gazette-এর Tagore Memorial Special Supplement-এ ঠাকুর-পরিবারের বংশলতায় লিখিত হইয়াছে, কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের 'গাঁই'—'বন্দ্যোপাধ্যায়'। কিন্তু কুলশাস্ত্রে জানা যায় ঐ পরিবারের গাঁই 'কুশারি', কারণ উহার আদিপুরুষ 'দীন' (বা 'কোয়') 'কুশারি'। এক পরিবারের দুই গাঁই নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং ইহা বিষম অর্থাৎ সাম্যহীন বা অসঙ্গতিমূলক ভ্রম,—এই সিদ্ধান্ত করিয়া, আমি শ্রীযুত অমল হোম মহাশয়কে পত্রে জানাইয়াছিলাম। হোম মহাশয়, যে কারণেই হউক, তাহার উত্তর দেন নাই, (১) পরে "রবীন্দ্র-কথা"-র সঙ্কলয়িতা ঠাকুর-বংশের তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয় লিখিলে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তরে জানাইয়াছেন,—কলিকাতার ঠাকুরবংশীয়দের 'কুশারি' গাঁই, সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। বিশ্বকবির বংশপরিচয়ে কোন অসঙ্গতিমূলক ভ্রম-প্রমাদ থাকে, ইহা বিচারসম্মত মনে হয় না। এই হেতু ঐ পরিচয়ের মধ্যে যে যে বিষয়ে ঐরূপ ভ্রম বুঝিতে পারা গিয়াছে, সংশোধনের আশায় তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। **"ঠাকুর-পরিবার 'বন্দ্যোপাধ্যায়'"**—বংশপরিচয়ে জানা যায়, ঠাকুর-পরিবার পিঠাভোগের 'কুশারে'-গাঁই শ্রোত্রিয় জমিদার জগন্নাথের বংশধর। কুশারি গাঁই-এর আদিপুরুষ দীন (বা কোয়) কুশারি। ইনি শাণ্ডিল্যগোত্রজ রাঢ়ীয় শ্রেণী ভট্টনারায়ণের ত্রয়োদশ পুত্র। রাজার নিকটে বাসার্থ ইনি 'কুশারি' গ্রাম প্রাপ্ত হন, তদনুসারে ইঁহার

---

(১) এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে হোম মহাশয় আমাকে পত্রে জানাইয়াছিলেন,—সে পত্র তিনি পান নাই।

অধস্তন সন্তানগণের গাঁই 'কুশারি'। পক্ষান্তরে, ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র বরাহ 'বন্দ্য' গ্রাম প্রাপ্ত হন ও সেই স্থানে বাস করেন, এই হেতু তাঁহার পরপুরুষগণের গাঁই 'বন্দ্য, বন্দ্যঘটীয় বা বন্দ্যোপাধ্যায়'। এইরূপ আদিপুরুষানুসারে সম্বন্ধে 'কুশারি' ও 'বন্দ্যোপাধ্যায়' গাঁই স্বতোবিরোধী, অর্থাৎ 'কুশারি' 'বন্দ্যোপাধ্যায়' নহেন এবং 'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'কুশারি' হইতে পারেন না; অতএব কলিকাতার ঠাকুরপরিবারের গাঁই 'কুশারি', 'বন্দ্যোপাধ্যায়' নহে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধবিশেষে (২) নিজ নামের পরিবর্ত্তে 'বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখিয়াছেন, সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয়, তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়াই, ঐরূপ উপাধিভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আদিপুরুষানুসারে গাঁইএর বা উপাধির অনুসন্ধান করেন নাই।

২। **"ভট্টনারায়ণ প্রথম 'কুশারি'"**—ভট্টনারায়ণের ত্রয়োদশ পুত্র দীন, 'কুশারি'-গাঁইএর আদিপুরুষ, ইহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং দীন কুশারির পূর্বেই তাঁহার পিতা ভট্টনাবাযণ প্রথম 'কুশারি', ইহা নিতান্ত সঙ্গতিহীন ও ভ্রমাত্মক।

৩। **"যশোহরের গুড়ী শুকদেব 'আদি পীরালী'র অন্যতম"**—খান জাহান আলী নামে এক ব্যক্তি সুন্দরবন আবাদ করিবার সনন্দ লইয়া যশোহরে উপস্থিত হন। মামুদ তাহির তাঁহার উজীর ছিলেন। তাহির পূর্বে এক কুলীন ব্রাহ্মণের নাতি ছিলেন। এক মুসলমানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন (৩)। ইঁহার পূর্ব নিবাস পিরলিয়া গ্রাম, এই কাবণে, অথবা মুসলমান ধর্ম্মে গোঁড়ামি হেতু ইঁহাকে

---

(২) দ্রষ্টব্য, প্রবাসী ১৩৩৪ সাল, শ্রাবণ। ৫১৩—৫১৮ পৃঃ। 'রেভারেণ্ড্ টমসনের বহি—' প্রবন্ধ।

(৩) দ্রষ্টব্য, "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'—ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা।

সকলেই 'পীর আলী' বলিয়া ডাকিত। কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ীয়শ্রেণী দক্ষের প্রথম পুত্র 'ধীর', রাজার নিকটে বাসার্থ 'গুড' গ্রাম প্রাপ্ত হন; তদনুসারে ইঁহার গাঁই—'গুড়'। ধীব গুড়ের অধস্তন একাদশ পুরুষ দক্ষিণডিহি-নিবাসী দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরী। দক্ষিণানাথেব চারি পুত্র—কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব তাহিরের প্রধান কর্ম্মচারী বা দেওয়ান ছিলেন। এই তাহিরই ইঁহাদিগকে কৌশলে বলপূর্বক মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করান (৪), ইঁহাদের মুসলমানী নাম কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও জামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী। অতএব, ইঁহারাই 'পীর-আলী' কর্তৃক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত 'আদি-পীরালী' (Original Pirali)। ইঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি দক্ষিণডিহির পৈতৃক বাটীতে রতিদেব ও শুকদেবের সহিত কিছুকাল অবস্থান করেন এবং সেই সূত্রে ও পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হেতু কামাল উদ্দীন ও জামাল উদ্দীন পৈতৃক বাটীতে যাতায়াত করিতেন; এই হেতু রতিদেব ও শুকদেব সমাজচ্যুত হন। সুতরাং, গুড়ী শুকদেব 'আদি পীরালী' নহেন, 'পীরালী' ভ্রাতাদের যাতায়াতে 'পীরালী'-দোষে দূষিত হইয়াছিলেন, বলা সঙ্গত। পিঠা-ভোগেব জগন্নাথ কুশারি গুড়ী শুকদেবের কন্যা বিবাহ করিয়াই ঐরূপে 'পীরালী'-দোষে দূষিত হন, সুতরাং, জগন্নাথের বংশধব ঠাকুর-পরিবারও ঠিক 'পীরালী' নহেন। 'পীরালী'-দোষে দূষিতমাত্র।

৪। **"পঞ্চানন ঠাকুর"**—দীন কুশারির অধস্তন পুরুষ জগন্নাথ কুশারি; ইঁহার পরবর্ত্তী সপ্তম পুরুষ 'পঞ্চানন'। পঞ্চানন যশোহরের বাটী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মের নিকটস্থ গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দপুরের স্থানীয় বণিকেরা পঞ্চাননকে 'ঠাকুর মশাই' বলিতেন। 'ঠাকুর মশাই'র অর্থ 'পূজনীয় ব্রাহ্মণ'—

---

(৪) দ্রষ্টব্য, "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা।

ইহার ইংরাজী অনুবাদ 'Revered Sir', ঠিক বলিয়া মনে হয় না, 'Revered Brahman' হইলেই বোধ হয় ভাল হয়। পল্লীগ্রামে এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর মশাই' বলিয়া সম্বোধন করেন। এই 'বর্ণ'বাচক 'ব্রাহ্মণ'-অর্থে 'ঠাকুর' শব্দ হইতে 'ঠাকুর' বা ইংরাজী 'Tagore' পরে উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আদি পুরুষ 'দীন কুশারি' বা 'জগন্নাথ কুশারি'র গাঁই-অনুসারে মৌলিক পরিচয় 'কুশারি' গাঁইএর আর কোন চিহ্নই নাই, ফলে, ঠাকুর-পরিবার 'পীরালী বামন' এইমাত্র পরিচয়ে সাধারণে বিদিত, বস্তুতঃ, ঠাকুর-পরিবার তাদৃশ নগণ্য পরিচয়ের ব্রাহ্মণ নহেন। পরিচয়ে গাঁইএর উল্লেখ থাকিলেই বংশের আদির বা গোড়ার কথা সুস্পষ্ট থাকিত, এরূপ নগণ্যতার স্থান থাকিত না। মূলে ভুল হইলেই, কুলনির্ণয় এইরূপ দুরূহ হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তাবান্তর

টাউন্‌হলে সর্ তেজবাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ সভার অধিবেশনে যে যে বিষয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়, ১৩৪৯ সালের বৈশাখের "প্রবাসী"র "বিবিধ প্রসঙ্গে" "রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন" প্রবন্ধে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সেগুলির উল্লেখ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পড়িয়া, আমার প্রতি কবির একটি বিশিষ্ট আদেশ প্রস্তাবরূপে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া আমি সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করিলাম। কবির স্মৃতিরক্ষার্থ যে সকল উপকরণ উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাও তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কবিস্মৃতি ইহাতেও চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

কবি যখন "উত্তরায়ণে" অসুস্থ ছিলেন, সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে সুবিধামত তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে তাঁহার কাছে যাইতাম। একদিন সকালে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইলে, তিনি ধীর মৃদু-স্বরে আমার অভিধানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার জীবনের পরিধি বাড়ে, তা হ'লে অভিধান শেষ ক'রে তোমাকে আর একটি কাজ ক'রতে হবে।" আমি বিনীতভাবে জানাইলাম—"আদেশ করুন।" তখন তিনি বলিলেন,—"বাঙলা ভাষায় প্রাদেশিক শব্দের ভাল অভিধান নাই, সকল প্রদেশের কথ্য ভাষার শব্দ সংগ্রহ ক'রে একটা অভিধান ক'রতে হবে।" আমি বলিলাম,—"যদি আমার এই অভিধান জীবনে শেষ হয়, আর আমার কাজের শক্তি থাকে, তা হ'লে আমি আপনার এই আদেশ কার্যে পরিণত ক'রতে চেষ্টা ক'রবো, ত্রুটি ক'রবো না।" কবি তখন আশীর্বাদ করিলেন,—"তুমি পারবে, আমি

ব'লছি।" কবির স্বর্গারোহণের পরে, পাছে আমি এ কথা ভুলিয়া যাই, এই ভাবিয়া শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথকে ও মাননীয় "প্রবাসী"র সম্পাদক মহাশয়কে এ বিষয় বলিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, আমার জীবনেই হউক, আর জীবনান্তেই হউক, সুবিধা হইলে, কোন-না-কোন সময়ে বাঙ্‌লা ভাষার উন্নতিকল্পে কবির এই আদেশ কার্যে পরিণত হইবে। এক্ষণে "বিশ্বভারতী"র কর্তৃপক্ষগণকে এ বিষয় বিশেষভাবে জানাইতেছি; তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন, মনে হয় না।

কবিগুরুর এই আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইলে বাঙ্‌লাভাষার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করিয়া, সেই সমিতির উপরে ইহার কার্যভার অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ সমবেত চেষ্টায় অভিধানের কার্য অবাধে চলিতে পারে, মনে হয়। ইহা একের কার্য নহে—মহৎ কার্যে মহান সমবায় সিদ্ধির সুফলপ্রসূ।

সমিতিগঠনের পরে, প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ অভিধানের কাযে প্রথম পদ্ধতি—ইহাও সমবায়ের চেষ্টাসাধ্য বিষয়। এই হেতু প্রদেশ বিভাগানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শব্দতত্ত্বরসিক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। সংগৃহীত শব্দ-সমূহ কিরূপ প্রণালীতে লিখিলে সুব্যবস্থিত ও অভিধানেব উৎকর্ষজনক হয়, তাহা সমিতির সভ্যগণ বিচারপূর্বক নির্ধারণ করিলে, তদনুসারে অভিধান লেখার কার্য চলিবে।

"বিশ্বভারতী" এই কাযের সবিশেষ ভারগ্রহণ করিয়া প্রধান কেন্দ্র হইলেও, ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ— এই বিদ্যাকেন্দ্রদ্বয়ের সহযোগিতার আশা বিশ্বভারতী বিশেষভাবে করিলে, তাহা অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে বলিয়া বোধ হয় না; অন্য শাখাসাহিত্যপরিষৎসমূহের সহকারিতার আশাও দুরাশা বলা যায় না।

বস্তুতঃ এইরূপ কার্যে সকল বিদ্যাকেন্দ্রেরই সাহায্য বিশেষ আবশ্যক এবং ইহাও বলা অসঙ্গত নহে যে, তাঁহারা ভিন্ন প্রদেশের হইলেও, ব্যাপক সাহিত্য সম্পর্কে ইহাতে তাঁহাদেরও সাহিত্য রহিয়াছে।

এই কার্য যেমন ব্যাপক, তেমনই ব্যয়বহুল; সুতরাং কেবল কর্মে সহকারিতা করিলে, অর্থাভাবে তাহা অনর্থক আয়োজন হইবে। সার্থক করিতে হইলে অর্থসঞ্চয় চাই। কর্মীরা দক্ষিণা না পাইলে স্ব-স্ব কর্মে দক্ষতা দেখাইতে শৈথিল্য করেন, তাই সকল কর্মেই দক্ষিণার ব্যবস্থা। এই হেতু অর্থকোষের বিষয় বিশেষ বিবেচ্য। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যদি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থলাভের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বিশ্বভারতীর অভিধানের অর্থকোষের বিশেষ শক্তিসঞ্চয় হয়; বৃত্তিপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও স্ব-স্ব কার্য নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আশাতীত ফল দেখাইতে পারেন।

"প্রবাসী"র সম্পাদক মহাশয় কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিষয়সমূহের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ববিধান ও বিশ্বভারতীর কার্যের সম্প্রসারণ—এই দুইটি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই দুইটির জন্য যে অর্থ আবশ্যক, তাহা সংগৃহীত ও সংগৃহীত-অর্থে ঐ দুইটি কার্য সম্পন্ন হইলে, উদ্বৃত্ত অর্থে স্মৃতিরক্ষার্থ অন্য কোন কোন কার্য করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমার প্রস্তাব যে, ঐ উদ্বৃত্ত অর্থের কিয়দংশে অভিধানের ধনকোষের সূত্রপাত করিলে ভাল হয়। সে কোষ স্বল্পধন হইলেও, অল্প অল্প সঞ্চয়ে ক্রমে তাহা স্বকার্যসাধনে শক্তিমান্ হইতে পারে। বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বভারতীর মূল এইরূপ স্বল্পকপর্দকেরই কোষ। বনস্পতি বিশাল বটের মূলবীজ অতিসূক্ষ্ম।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক শব্দ-কোষ

'বঙ্গীয়প্রাদেশিকশব্দ-কোষ'-সঙ্কলনের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদেশ সাহিত্যিকমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসীতে' যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে কোষসঙ্কলনে বিশ্ব-ভারতীর অভিপ্রায় জানিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রাদেশিকশব্দসংগ্রহসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আষাঢের প্রবাসীতে সাহিত্যিকগণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ কবিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ প্রবন্ধপাঠে জানা যায়, 'বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে'র জন্মের বহু পূর্ব হইতে গ্রাম্যশব্দসঙ্কলনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ সকল সাময়িক উদ্যোগের ফলে সংগৃহীত শব্দসমূহও মধ্যে মধ্যে পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎ ইহার পরে এ বিষয়ে একবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে উদ্যোগ সফলতায় পরিণত হয় নাই। তবে বোধ হয়, ঐ উদ্যোগেরই ফলে বিদ্যাসাগর-কৃত 'শব্দসংগ্রহ' এবং ঢাকা ময়মনসিং রঙ্গপুর মালদহ পাবনা যশোহর খুলনা নদীয়া চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি প্রদেশের গ্রাম্যশব্দসঙ্কলন পবিষৎপত্রিকায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পবিষদেব ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকগণের পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টাব ফলে কথ্যভাষার শব্দসংগ্রহকার্য্য বেশ কিছুদূব অগ্রসর হইয়া আছে।' এক্ষণে কবিবরের এই অন্তিম আদেশে বিশ্বভারতীব উদ্যোগ যাহাতে পূর্ব্ববৎ অসম্পাদিত অবস্থায় পর্য্যবসিত না হয়, তদ্বিষয়ে সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানসমূহেব এবং বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণেব সমবেত প্রচেষ্টার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ইতঃপূর্ব্বে কোচবিহাব ও শ্রীহট্টেব দুইজন সাহিত্যিক পণ্ডিতকর্ম্মী বিশ্বভারতীকে শব্দসঙ্কলনবিষয় পত্রে জানাইয়াছেন।

এই শব্দকোষ কি প্রণালীতে লিখিতে হইবে এবং কি প্রকার গ্রাম্য শব্দ ইহার জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে,—এ বিষয় কেহ কেহ জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে অভিধানের লেখনপ্রণালী প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) বাঙ্‌লা শব্দ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—প্রাকৃত বাংলা ও দেশী বাঙ্‌লা শব্দ। সংস্কৃত হইতে তদ্ভব প্রাকৃতের অপভ্রংশ আকৃতি প্রাকৃত বাঙ্‌লা শব্দ। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শনার্থ, মূল সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমিক পরিবর্ত্তনে পালি ও প্রাকৃতের রূপ এবং সুবিধামত তদনুযায়ী হিন্দী পঞ্জাবী মরাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার অপভ্রংশ শব্দের রূপ লিখিতে হইবে। যেমন, সংস্কৃত 'পার্শ্ব' হইতে প্রাকৃত 'পস্‌স', বাঙ্‌লা 'পাশ'। এইরূপ, 'শীর্ষ' হইতে প্রাকৃত 'সিস্‌স', বাঙ্‌লা 'সীস' 'শীষ'। দেশী শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে হেমচন্দ্রের 'দেশী নাম-মালা'য় যদি ঐ শব্দ ধৃত হইয়া থাকে, তবে তাহাই দিতে হইবে। তদভাবে কেবল 'দেশী শব্দ' বলাই ভাল। সম্ভব হইলে, তামিল তেলেগু প্রভৃতি দ্রবিডীয় ভাষাব সমর্থক শব্দ যোজনা কবিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্‌লা ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দ আছে। যেমন, 'ঠনঠন', 'টনটন', ইত্যাদি।

(২) বাঙ্‌লায প্রচলিত আরবী ফারসী পর্টুগীজ প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষার শব্দের সহিত সেই সেই ভাষার বিশুদ্ধ মূল শব্দ দিতে হইবে।

(৩) শব্দের অর্থ—প্রথমে বাঙ্‌লা শব্দের মূলগত অর্থ, পরে গৌণার্থ ও তাহার পরে ব্যাপক অর্থ। যেমন, বাঙ্‌লা 'শুক্ত' বা 'শুক্তা' শব্দ, ইহার মূলশব্দ 'শুষ্কতিক্ত', তদনুসারে অর্থ 'শুষ্কতিক্তপত্র' অর্থাৎ 'শুখনা তিত-পাটেব পাতা' বা 'না'লতা', ইহা মূলগত বা মুখ্য অর্থ। পরে গৌণার্থে 'না'লতার তিক্তব্যঞ্জন', অর্থাৎ না'লতাপাতাব শুক্তা। ইহাব

পরে ব্যাপক অর্থে, নিম পলতা প্রভৃতির শুখনা বা কাঁচা পাতার তিক্ত-ব্যঞ্জনমাত্রও 'শুক্তা'।

কবিকঙ্কণে যে 'শুকুতার পাত' (১৯৮ পৃষ্ঠ), 'হুকুতার পাতা', 'হুক্তা পাতা' (২৪৯ পৃষ্ঠ) বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই শুষ্কতিক্তপত্র বা না'লতাপাতা। এইরূপ সম্ভব হইলে, শব্দের মুখ্যার্থ গৌণার্থ ও ব্যাপক অর্থ লিখিতে হইবে।

(৪) শব্দের অর্থসমর্থনের নিমিত্ত প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্লাভাষার প্রসিদ্ধ কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে শিষ্টপ্রয়োগ উদ্ধৃত করিতে হইবে। ভাষায় প্রচলিত 'প্রবচন' এবং লোকমুখে প্রচলিত 'লৌকিক বাক্য' শিষ্ট-প্রয়োগের কার্য্য করে; সম্ভব হইলে, তাহারও প্রয়োগ করিয়া অর্থ সমর্থন করিতে হইবে। যেমন, প্রবচন—'উন (বা উনু) ভাতে দুন (বা দুনু) বল। ভরা ভাতে রসাতল॥' এস্থলে 'উন' শব্দের অর্থ 'পূর্ণতার কিছু কম'; এই প্রবচন ঐ অর্থেরই সমর্থক। প্রবচনের অভাবে লৌকিক বাক্য, যেমন—'গাঁয় মানে না, আপনি মোড়ল।' এখানে এই বাক্য 'মোড়ল' শব্দের অর্থের সমর্থক। ঐ তিনের অভাব হইলে, শব্দের প্রচলিত অর্থই দিতে হইবে।

(৫) বাঙ্লার ধাতু প্রায়ই তদ্ভব প্রাকৃতধাতু হইতে উৎপন্ন; তদ্ভিন্ন শব্দ হইতে উৎপন্ন নামধাতুও আছে। প্রাকৃত বাঙ্লা ধাতুর ব্যুৎপত্তিতে সংস্কৃত ধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পালি প্রাকৃত হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি ভাষার তদর্থক অনুরূপ ধাতু দিতে হইবে। যেমন, বাঙলা 'কর' ধাতু, ইহার সংস্কৃত ধাতু 'কৃ', হিন্দী মরাঠী গুজরাটী মৈথিলী ধাতু 'কর', অসমীয়া ধাতু 'কর্',। নামধাতু 'হাতা', 'হাত' হইতে উৎপন্ন, প্রয়োগ 'হাতান', 'হাতাইয়া' ইত্যাদি। এইরূপ 'কাতর' হইতে ধাতু 'কাতরা', প্রয়োগ 'কাতরান'।

(৬) শব্দের বিন্যাসে বর্ণক্রম—বাঙ্লার বর্ণমালায় যেরূপ স্বর ও

ব্যঞ্জনের পাঠক্রম আছে, শব্দকোষে সেইরূপ বর্ণানুক্রমে শব্দ বিন্যাস করিতে হইবে। ং ঃ ँ—এই তিনটি স্বরাশ্রিত, সুতরাং পদবিন্যাসে স্বরবর্ণের পরেই ইহাদের স্থান সঙ্গত, যেমন, অ আ ই ঈ ঔ অং অঃ অঁ ক খ গ ইত্যাদি। দুই বর্ণের শব্দে ঐ নিয়মে অ অঅ অআ · অঔ অং ·অক্ অকা অকি ইত্যাদি ; (ব্যঞ্জনাদি শব্দে) ক কআ কই··· কঔ কং কঃ কঁ কক্ কক ককা ককি ইত্যাদি।

(৭) বানান—প্রাকৃত বাঙ্‌লা শব্দের বানান এক বিষম সমস্যা। প্রাচীন বা আধুনিক পুস্তকে, প্রবন্ধে মাসিক পত্রিকাদিতে এক শব্দেরই বিভিন্ন বানান দেখা যায়। এরূপ স্থলে, তদ্ভব প্রাকৃত হইতে বাঙ্‌লায় যে সকল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সংস্কৃতানুসারে যথাসম্ভব বর্ণ ঠিক রাখিয়া তাহাদের বানান করিলে, অনেক স্থলে বানান-সমস্যার মীমাংসা হয়। পুস্তকে ধৃত শব্দের পক্ষে ধৃত পাঠ অবিকল লিখিয়া পরে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতানুসারে বানান লিখিলে ভাল হয়। যেমন, 'সজ্ঞান' হইতে 'সেয়ানা', 'শয্যা', হইতে 'শেজ', 'স্বপ্' ধাতু হইতে 'স্থ' ধাতু সংস্কৃতানুযায়ী, বৈষ্ণব সাহিত্যে 'কাঞ্চনী' হইতে 'কাঁচনী', 'দৃষ্টি' হইতে 'দিঠি' বা 'দীঠি' শব্দ সংস্কৃতানুযায়ী। ফারসী 'যখনী' হইতে 'আখনী', 'খুশী্' হইক্তে 'খুশী' ('খুসী' নহে) মূলানুযায়ী।

(৮) বাঙ্‌লায় 'এক', 'এত' ইত্যাদির 'এ'-কার আড়ে উচ্চারিত হয়। প্রাচীন বাঙ্‌লায় এরূপ স্থলে 'যা' দ্বারা ঐরূপ উচ্চারণ সূচিত হইয়াছে। যেমন, 'অ্যাক' 'অ্যাকে অ্যাকে' ইত্যাদি। তদনুসারে 'এক' (এ্যাক), 'এত' (এ্যাত) এইরূপ লিখিলে ভাল হয়।

(৯) উচ্চারণ—বাঙ্‌লা শব্দের উচ্চারণ শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেরই জানা আছে। দেশবিশেষে উচ্চারণ কিছু পৃথক্ আছে সত্য, কিন্তু অভিধানে কোন এক বিশিষ্ট দেশের ভাষা প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত, নচেৎ গ্রন্থবাহুল্যের সম্ভাবনা। অতএব প্রত্যেক শব্দেব পরে তাহার

উচ্চারণপ্রকার না লিখিলে অভিধানের বিশেষ অঙ্গহানি হয় বলিয়া মনে হয় না। তবে, যে সকল শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্যে অর্থভেদ হয়, অথবা যে শব্দ সাধারণের তত পরিচিত নহে, তাহাদেরই পরে উচ্চারণ-প্রকার লিখিলে ভাল হয়, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'মত' (মত্), 'মত' (মোতো) ইত্যাদি।

(১০) প্রাদেশিক শব্দসঙ্কলনে গ্রহণ-বর্জ্জন সম্বন্ধে কোন নিয়ম করা যায় বলিয়া মনে হয় না। ভদ্র ভদ্রেতর, অর্থাৎ সাধারণ লোক যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, তাহারই শব্দ এই অভিধানের বিষয় হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, যে সকল শব্দের ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল, ক্রমে কালাতি-পাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাহাদেব প্রযোগ হয়, অথবা প্রয়োগই হয় না, সেই সকল শব্দ সংগৃহীত না হইলে, ভাষাতত্ত্বের সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ হইবে না। অতএব ঈদৃশ অপ্রচলিত বা বিরলপ্রয়োগ শব্দ পরিত্যক্ত না হওযাই বাঞ্ছনীয়।

(১১) শব্দের সহিত যদি কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, উপাখ্যান, সামাজিক আচার ব্যবহার বা সভ্যতা অথবা ঘটনাবিশেষের সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে ঐ শব্দের সহিত তাহার বিবৃতি দিতে হইবে, নচেৎ ঐ সকল শব্দ নিরর্থক ও নীরস হইয়া পড়িবে। যেমন, 'দশচক্র' শব্দে 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', 'যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন' ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য 'দশচক্র', 'যাঁহা' (বঙ্গীয়-শব্দকোষ)।

(১২) দেশবিশেষে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা গুল্ম তৃণ ফল পুষ্প, মৎস্যাদি জলজন্তু, সর্পাদি সরীসৃপ, ধান্য মুদ্গ মসূরাদি শস্য—ইহাদের নামের পার্থক্য আছে। ঐ সকলেব নাম সংগ্রহ করিয়া, জানা থাকিলে, তাহাদের সহিত অন্য দেশে তাহাদেরই নামান্তর দিতে পারিলে তত্তদ্বিষয়ে পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। গাড়ী পাল্কি দোলা ডুলী, তাঁত, নৌকাদি জলযান—ইহাদের অবয়ববাচক শব্দ, কৈবর্ত্ত জেলে বাগ্‌দী

প্রভৃতি মৎস্যব্যবসায়ীর মৎস্য ধরার নানাপ্রকার জাল ও বাঁশের যন্ত্রের আকৃতিগত নানাবিধ নাম অভিধানের বিষয় হইবে। এতদ্ভিন্ন দেশ-বিশেষে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করা সংগ্রাহকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি উল্লেখ করিয়া বলা অসম্ভব।

(১৩) জমিদারী মহাজনী কার্য্য ও বাজার হিসাবে প্রচলিত ভূরি ভূরি পারিভাষিক শব্দ আছে। ইহাদের অধিকাংশেরই মূল আরবী বা ফারসী শব্দ। ঐ সকল বিভাগের শব্দ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত মূল আরবী বা ফারসী শব্দ উল্লেখ করিতে হইবে।

উপরে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, তাহাতে অভিধানের বক্তব্য নিঃশেষ হইয়াছে, ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিবেন না। বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় ইহা স্থূল সংক্ষেপমাত্র। অভিধানের কার্য্য আরব্ধ হইলে, কার্য্যক্ষেত্রে গুরুলঘু নানা প্রশ্নের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপস্থিত হইবে। আপাততঃ শব্দসংগ্রহকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ ও সাহিত্যিকগণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশিত হইল।

সভাপতির অভিভাষণ

শান্তিনিকেতন

৮ই পৌষ, ১৩৪৯

স্নেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডলী, স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্রীগণ, বহু-কালের পরে আজ আমি সম্মিলিত তোমাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করেছি। তোমরা যখন ছাত্রছাত্রী ছিলে, তখনও এইরূপ তোমাদের নিয়ে বসেছি—শিক্ষা দিয়েছি; সে অনেক দিন আগেরই কথা, সে সময় এরূপ সমবায় হয় নি—শ্রেণীবিভাগানুসারেই হয়েছিল; অতএব এটা ঠিক সেটা নয়—এটা মিলিত সব প্রাক্তন ছাত্রদের সভা। আমি যে আসন পেয়েছি, তা সভাপতির আসন; যেরূপ যোগ্যতা এর গৌরব রক্ষা কত্তে পারে, সে যোগ্যতা আমার নেই—আমার মনে হয়, আসন এতে কলঙ্কিতই হয়েছে। তবে এ আসন কেন গ্রহণ করেছি?—এর উত্তরে বক্তব্য,—এটা সেরূপ সভাপতির আসন নয়; সে সভা বিশিষ্ট সভ্যমণ্ডলীর সভা, সে সভায় সভাপতির আসন বস্তুতঃই গৌরবমণ্ডিত। আর এ সভা আমার পুত্রবৎ প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডলীর সভা, এ সভায় বা ছাত্রসমবায়ে সভাপতির বা শিক্ষক-সভাপতির আসন গ্রহণ করার যোগ্যতা আমার আছে; এ গৌরব ছাত্রসমূহের কাছে শিক্ষকের গৌরব—গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধের গৌরব—পুত্রের কাছে পিতার গৌরব; এতে কারও বিদ্যাবত্তার বিচারণা আসতে পারে না; পাণ্ডিত্যের আধিক্য থাকলেও, তোমাদের কাছে যখনই আসবো, তখনই তোমাদের সেই বাল্যকালের ছাত্রজীবনের কথাই আমার মনে আসবে, ভাববো তোমরা সেই বালক, আমি সেই শিক্ষক, তোমাদের পাণ্ডিত্যের কথা স্নেহপ্রবণ মনে স্থানই পাবে না। মনে এইভাব নিয়েই তোমাদের মধ্যে এই শিক্ষক-সভাপতির আসন গ্রহণ করেছি। প্রথমে এ বিষয়ে আপত্তি করেছিলাম,

কিন্তু এই বাৎসল্যের কথাই আমাকে শেষে নিরুত্তর করে সম্মত করেছিল। আমি তোমাদেরই উপদেষ্টা হয়েই তোমাদের সভায় এসেছি।

১৩০৯ সালে ভাদ্রের প্রথমে আমি আশ্রমে কবির আশ্রয় পেয়েছি। এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর আমরাও কবিকে অধ্যাপকসভায় অধ্যাপকগুরু-সভাপতির আসনে বসিয়েছি, আমরা অধ্যাপক-ছাত্ররূপে তাঁর উপদেশ গ্রহণে অভিমুখ হয়ে চারিদিকে বসেছি—তাঁর অনুশাসনবাণী নতভাবে গ্রহণ করেছি। তোমাদের মধ্যে এই আসনে বসে আমার এই কথাই মনে হচ্ছে—কবিগুরু আর আমরা, আমরা আর তোমরা—এই দুই বিভাগক্রম; এই দুইটি বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও, বস্তুতঃ পৃথক্ নয়—উভয়ত্র বিষয় উপদেশ, উপদেষ্টা উপদিষ্ট নিয়েই বিভাগকল্পনা। তোমরা ভাবতে পার,—আমরা প্রাপ্তবয়স্ক, এখনও অনুশাসনের পাত্র! এরূপ মনে করায় তোমাদের একটু ভুল আছে—কবিগুরুর কাছে আমরা বৃদ্ধ হয়েও বালক ছিলাম, তিনি অনুশাসনের পাত্রবুদ্ধিতেই উপদেশ দিয়েছেন; তোমাদের পক্ষেও ঠিক তাই—বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও, আমাদের কাছে তোমরা সেই ছাত্রবয়স্ক বালকই। কবি স্বর্গগত, এখন আমরা বৃদ্ধ; আমাদের অবিদ্যমানতায়ই তোমাদেব বার্দ্ধক্য গণনীয় হবে। অতএব তোমবা উপদেশেব পাত্র।

কবির আশ্রয়ে আমার জীবনের দীর্ঘকাল—উৎকৃষ্ট অংশ অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ে যে শিক্ষালাভ হয়েছে, তাও উৎকৃষ্ট—অমূল্য রত্ন—আমরণ জীবনপথেব পাথেয়। এই দীর্ঘকালে তাঁর ক্রিয়াকলাপে যে সকল গুণগরিমা লক্ষ্য কবেছি, তার মধ্যে কিছু কিছু তোমাদের কাছে বলবো।

আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন বিদ্যালয়ের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—বিশ্বভারতীর শৈশবকাল। চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য। মন্বাদি প্রণীত সংহিতায় ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল বিধি বিহিত হয়েছে, এই

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সেগুলি সাকল্যে গৃহীত হয়নি—দেশকালপাত্র-বিচারে যেগুলি এখন অনুষ্ঠেয় সেগুলিই কবি গ্রহণ করেছিলেন ; প্রাতঃস্নান, উপাসনা সাত্বিক ভোজন, নগ্নপদ, ছত্রত্যাগ, বিলাসিতা-বর্জ্জন, সংযম অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক তপস্যা—এইগুলি আশ্রম বালকের পালনীয় নিয়ম ছিল। জীবিতকাল চার ভাগে বিভক্ত করে আশ্রমানুসারে বিশেষ বিশেষ বিধির বিধানে ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যকাল হ'তেই নানা বিধি-নিষেধের কঠোরতার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারীকে সকল বিষয়ে সংযত ও শিক্ষিত করে পরবর্ত্তী গৃহীর জীবনযাত্রায় উপযোগী করে তোলা এবং গৃহস্থধর্ম্ম পরিপালনের পরে আশ্রমদ্বয়ে অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে উন্নীত করা। ছাত্রগণকে প্রথম জীবনেই সংযত-সহিষ্ণু ও কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত করার নিমিত্তই কবি প্রথমে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই নিয়মের কিছু কিছু এখনও চলছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠায় কবির অভিপ্রায় এই ছিল মনে হয়।* সেই কথাই তোমাদের আজ বল্লাম।

আশ্রম কবির মহাগৃহ, তিনি এই মহাগৃহে মহাগৃহস্থ সেজেছিলেন। গৃহস্বামী পরিবারবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রভৃতির নিমিত্ত যেমন সর্বদা সচেষ্ট

---

* "বিশ্বভারতী" পত্রিকার "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরে এই কথাই বলেছেন :—

"ছাত্রদের জীবনযাত্রা ছিল উপকরণবর্জিত—সহজ সরল, এমন কি কৃচ্ছ্রসাধনও আমাদের দৈনিক জীবনে অঙ্গীভূত ছিল বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। ব্রহ্মচর্যের আদর্শ ছিল বিদ্যালয়ের আদর্শ। আমাদের পরিধেয়ের অকিঞ্চিৎকরতা গেরুয়া আলখাল্লার তলায় আত্মগোপন ক'রে রাখতে হ'ত। শয্যা ছিল দুটি কম্বল আর আহার ছিল জেলকয়েদীর লবসীর মতো একান্ত একঘেয়ে। জুতো, চটি, ছাতা, মাথায় দেবার সুগন্ধি তৈল ইত্যাদি বিলাসিতার অঙ্গ হিসাবে নিষিদ্ধ ছিল।"

থাকেন, মহাগৃহস্বামী কবিও তেমনি তাঁর মহাপরিবার—অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী প্রভৃতির স্বাস্থ্য বিদ্যাশিক্ষা পীড়া আহারব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকতেন। স্বাস্থ্য বিদ্যাশিক্ষা ক্ষমা দয়া সংক্রামকে সাবধানতা ইত্যাদি বিষয় আমার "গুণস্মৃতি" প্রবন্ধে ও প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করেছি, এখন তোমাদের কাছে সেই বিষয়গুলির প্রবন্ধ পড়ব। (প্রবন্ধ পাঠ—দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রবন্ধ)।

অভিভাষণের উপসংহারে আমার বক্তব্য তোমরা এখন সংসারে প্রবেশ করেছ—সংসারী পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হয়েছ। কবিগুরুর যে সকল উপদেশবাণী তোমাদের কাছে বল্লাম, আশা করি, সংসারেব পথে এগুলি তোমাদের উপাদেয় পাথেয় হবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সংসাবে মনুষ্যনামের উপযোগী হও, সুস্থ দীর্ঘজীবী সুখী যশস্বী হও। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কৃপায় তোমাদেব সংসারযাত্রা সর্বথা শান্তিময় ও নিরাপদ হ'ক, অভীষ্ট সিদ্ধি হ'ক।

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনঃ
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽহং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

শৈবগণ শিবরূপে, বেদান্তিগণ ব্রহ্মরূপে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ বুদ্ধিতে, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃবোধে, জৈনগণ অর্হৎসংজ্ঞায় এবং মীমাংসকগণ কর্ম্মনামে যাঁহার উপাসনা করেন, সেই সর্বস্বরূপ ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগের বাঞ্ছিত ফল বিধান করুন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রিয় ভূতপূর্ব ছাত্রগণ, বহুকালের পর তোমাদের সমবেত চেষ্টায় আজ তোমাদের মধ্যে আসন পেয়েছি—বিশেষ আনন্দের বিষয়। এই আসনের সহিত আমার সুদীর্ঘকালের সম্বন্ধেই সেই পূর্বের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধের কথাই আমার মনে আসছে—তোমরা শিক্ষার্থীরা ছেলের মত চা'র পাশে আমাকে ঘিরে ব'সেছ, আমি শিক্ষকের আসনে পিতার বুদ্ধিতে তোমাদের কাছে নিয়ে ব'সেছি। আমাদের সেই গুরুশিষ্যভাব—পিতাপুত্রের সমবায় বড মধুরই ছিল, বার্দ্ধক্যে আমি সেই মাধুর্য বিশেষভাবেই অনুভব কচ্ছি,—এটা অনুভবেরই বিষয়, ব'লে প্রকাশ ক'রবার কথা নয়। তোমরাও বিশ্বভারতীর শৈশবাবস্থা সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গুরুর প্রতি শিষ্যোচিত ভক্তিশ্রদ্ধার এখনও অধিকারী—তোমাদের এই অনুষ্ঠানই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধ্যাপকদের প্রতি তোমাদের এই ভক্তিশ্রদ্ধার প্রমাণ এই যে প্রথম, তা নয়, পূর্বে সময়ে সময়ে এর কিছু কিছু প্রমাণ পেযেছি, কিন্তু এই অনুষ্ঠান যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনই সর্ববিলক্ষণ। অধ্যাপক-অধ্যাপিতেব এই যাবজ্জীবন সুখের সম্বন্ধ অতি প্রাচীনকালের আচায-ব্রহ্মচাবীরই, গুরুদেব এইটিই যথাসম্ভব পুনঃ প্রবর্ত্তিত ক'রবার নিমিত্তই এখানে ব্রহ্মচযাশ্রমের সূত্রপাত ক'রেছিলেন। তোমরা সেই আশ্রমের শিষ্য, সেই আশ্রমোচিত গুরু-শিষ্যের সেই সুখের সম্বন্ধরক্ষার্থই এই অনুষ্ঠান-বীজ আজ প্রথমই এই আশ্রমে রোপণ ক'ল্লে, আশা করি, এ বীজ, মরুদেশে রোপিত বীজেব মত, শুষ্ক-নষ্ট হবে না, ভবিষ্যতে উপযুক্ত কালে উপযুক্ত গুরুশিষ্যের সুসঙ্গতিজন্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে অক্ষয় এ বীজ সুফলপ্রসূ হবে। আশীবাদ করি, যেন এইরূপ সদনুষ্ঠানে গুরুজনের প্রিয়পাত্র হ'য়ে তোমরা সংসার-যাত্রা নির্বাহ কর।

তোমরা যে উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে আজ সমবেত হ'য়েছ, সে বিষয়ে এখন কিছু বলব।

তোমরা আমাকে ডেকেছ, পুত্রের ডাকে পিতার মতই আমি তোমাদের কাছে এসেছি; কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছিল, এই অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে আমার যোগ্যতার সুসঙ্গতি আছে কিনা, থাকলেও, তার সীমা কত দূর, অর্থাৎ যে উচ্চের আসন তোমরা আমাকে দিয়েছ, সে আসনে আমার ব'সবার অধিকার ঠিক আছে কি না; আমার মনে হয়, নাই; তবে আমার সিদ্ধান্তে তোমাদের মনের সায় মিলবে না, তাই এ বিষয়ে আর বেশী কিছু ব'লতে চাই না। তোমরা তোমাদের মনের সায়ে সায় দিয়ে এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'য়েছ, যোগ্যতা-অযোগ্যতার সংশয়-লেশমাত্রেরও ইহাতে স্থান নাই। তাই ইচ্ছা করি, তোমাদের এই অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সুসম্পন্ন হ'ক, আশ্রমে আদর্শভূত হয়ে থাক্। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করি।

অতঃপর এই অনুষ্ঠানের মূলের কথা কিছু অতিসংক্ষেপে বলি।—

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে এখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। পর বৎসর শ্রাবণের শেষভাগে এখানে এসে আমি অধ্যাপনায় যোগ দি; এই যোগসূত্রের সূত্র-ধারক ছিলেন গুরুদেব। আমার সৌভাগ্যোদয়ের সুসময়ও তখন পাকাভিমুখ। কবির উপরে তখন জমিদারীর কাজ-কর্ম দেখার ভার ছিল। আমার বড়দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আবেদনে কবি পতিসরের জমিদারী কাছারির কর্মচারিবিশেষের পদে আমাকে নিযুক্ত ক'রে পাঠান; সেটা ১৩০৯ সালের শ্রাবণের প্রথম ভাগ। এই মাসের শেষে গুরুদেব জমিদারীর কার্যপরিদর্শনে পতিসরে যান। সেই সময় তিনি তাঁর বোটে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন,— তুমি দিনে কাছারিতে কি কর। দিনের কাজ জানালে, রাত্রির কাজ জানতে চান। আমি তখন একটা সংস্কৃত বইএর পাণ্ডুলিপি কচ্ছিলাম;

বইয়ের নাম শুনে তিনি পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন, আমি এনে দেখালাম। পাণ্ডুলিপি দেখে তখন তিনি কিছুই বলেন নি; কিন্তু কার্য্য-কারণসূত্রে মনে হয়, তিনি তখনই কর্ত্তব্য স্থির ক'রেছিলেন, পরের কার্যে তা প্রকাশ হ'য়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসেই তিনি পতিসরের অধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখেছিলেন,—শৈলেশ, হরিচরণকে আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। অধ্যক্ষ মহাশয় কবির আদেশ জানিয়ে আমার মতামত চাইলে, আমি আনন্দের সহিতই কবির আদেশ গ্রহণ ক'ল্লাম, আমার মতও জানালাম; কারণ, যে পথে গিয়েছিলাম, সেটা আমার স্বভাবের সহজ পথের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায়নি, দারিদ্র্যের পীড়নে বাধ্য হ'য়েই আপাততঃ সেই পথ অবলম্বন ক'রেছিলাম। আমি আর বিলম্ব ক'ল্লাম না, সেই দিনই কলিকাতায় এসে, পরদিন বেলা প্রায় বারটার সময় শান্তিনিকেতনে অতিথিশালায় উপস্থিত হ'লাম। কবি তখন উপরে থাকতেন, ভৃত্য পাঠিয়ে তাঁকে জানালাম। আমার উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পেয়েই, তিনি নীচে এলেন, আমি বিনীতভাবে প্রণাম ক'ল্লাম। তিনি ব'ল্লেন, আমার সঙ্গে এস; আমি পিছু পিছু গেলাম। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমার পবিচয় দিয়ে স্নানাহারেব ব্যবস্থা ক'ত্তে ব'লে, তিনি চ'লে গেলেন। নগণ্য আমার প্রতি গুরুদেবেব এই অভিজাতবংশোচিত অমায়িক ভাব ও ইতিকর্ত্তব্যতানিষ্ঠা আমাকে তখন বড়ই অভিভূত ক'রেছিল; তখন এরূপ স্থলে প্রভুব কর্ত্তব্য কর্মচারীর উপরেই পড়ে, কোন প্রভুই, বোধ হয়, এটুকু পদমর্যাদার হীনতা স্বীকার ক'ত্তে চান না; কিন্তু কবির মনে সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। প্রথমেই তাঁর এই অমায়িকতায় সামাজিকতার পরিচয় যাবজ্জীবন আমার স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

এইরূপ ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ঘূরতে ঘূরতে আমি অবশেষে কবি-চক্রবর্ত্তীর চরণে চরম ও পরম আশ্রয় পেয়েছিলাম। সে কথা মনে

হ'লে, বাস্তবিকই আমার সৌভাগ্যগর্ব উপস্থিত হয়। আমি কোন পথে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে কোন পথে কোথায় এনে রাখলেন! এই পরিবর্তনের পরিণাম তখন নিগূঢ়। সে জীবনে, আর এ জীবনে কত বৈষম্য, কি বিসদৃশ পরিণতি, তা বিবেকবুদ্ধিতে এখন বেশ প্রতিভাত হ'চ্ছে। মহাপুরুষের কাযমাত্রেই ভগবৎপ্রেরণা থাকে, তার ভবিষ্যৎ কাযে পরিণতিতেই জানা যায়। জীবনে যদি কিছু উৎকর্ষ হ'য়ে থাকে, তার মূলাধার সেই বিশ্বকবির আশ্রয় সান্নিধ্য সাহচয।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যখন এলাম, তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা, বোধ হয়, চোদ্দ-পনর। সে সময়ে সংস্কৃতের পাঠ্য পুস্তক ছিল না, কয়েক পৃষ্ঠার সংস্কৃত-পাঠের পাণ্ডুলিপি গুরুদেব আমাকে দিয়ে ব'লেছিলেন, এইটা দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধতি-অনুসারে একটা সংস্কৃতপাঠ্য লিখতে আরম্ভ কর। সেই পাণ্ডুলিপির প্রণালী-অনুসারে আমি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ "সংস্কৃতপ্রবেশ" লিখেছিলাম। এই সময় কবি একদিন বাঙ্লার শব্দকোষ-সংকলনের কথা আমাকে বলেন। তাঁর আদেশে ও প্রবর্তনায়ই "বঙ্গীয় শব্দকোষ" অভিধান লিখতে আবম্ভ করি। সেটা ১৩১২ সাল, আটত্রিশ বৎসব পূর্বের কথা। প্রাচীন বাঙ্লা হ'তে আধুনিক বাঙলা-পযন্ত, অর্থাৎ ডাক-খনার সময় হ'তে কবির সমসময়-পযন্ত, প্রকাশিত বিখ্যাত বাঙ্লার কবি-লেখকগণের প্রসিদ্ধ কাব্য-প্রবন্ধাদি প'ড়ে অভিধানের শব্দ সংগ্রহ ক'বেচি আমি একাই, এ পথে কখনও কোনও সহায় পাই নি। বিদ্যালয়েব কাজ ক'রে অবসরমত অভিবানেব শব্দ সংগ্রহ ক'রেছি।

১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে কোন কারণে আমি কলিকাতার কোন কলেজে কাজ নিয়েছিলাম। তখন শব্দকোষ লেখা কিছু অগ্রসর হ'য়েছিল। এই সময় কবিসম্রাট্ মহাবাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকটে নগণ্য আমার জন্য বৃত্তিভিক্ষার্থী হ'য়েছিলেন। এই সদুদ্দেশ্য-

মূলক প্রবৃত্তিই তাঁর মনস্বিতার উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল, ইহা অনির্বচনীয়। মহারাজের প্রদত্ত এই বৃত্তি নিয়ে গুরুদেবের আদেশে আমি শান্তিনিকেতনে আসি। তখনও ব্রহ্মচর্যাশ্রম, তোমরা সেই আশ্রমেরই গুরু-শিষ্যসম্বন্ধেরই শিষ্য বা ছাত্র। কবি আশ্রমে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য অখণ্ডিতভাবে প্রবর্ত্তিত কত্তে চান নি, দেশকালপাত্রভেদে ব্রহ্মচর্যপালন যতদূর সম্ভব, তাই তাঁর অভীষ্ট ছিল, সে ইষ্টাপত্তি তাঁর অভিপ্রায়ানুরূপ পূর্ণ না হ'লেও, তাঁর প্রযত্ন যে সর্বাংশেই ব্যর্থ হয়েছিল, তা মনে হয় নি; এখন তাব প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাচ্ছি। তোমরা সেই আশ্রমের ছাত্র, তাই গুরুদক্ষিণার শিষ্য, গুরু-দক্ষিণার শিষ্যেরই গুরুত্ব নিয়ে গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আজ সমবেত হ'য়েছ। এখন তিনি জীবিত থাকলে, তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এইরূপে ফলবতী হ'য়েছে দেখলে, তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না, তাঁর প্রসাদপ্রফুল্ল মুখের আশীর্বাদে তোমাদের এ অনুষ্ঠান ষোলকলায় সম্পূর্ণ হ'ত; তোমরাও চরিতার্থ হ'তে, আমারও পরিতৃপ্তি পরিপূর্ণ হ'ত! আমার দুর্ভাগ্য, সেই সৌভাগ্যের অধিকারী নই!

বৃত্তিলাভের ত্রয়োদশ বৎসরে ১৩৩১ সালে অভিধানের কার্য শেষ হয়। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে শব্দ-কোষের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করি। ১৩৪০ সালেব বৈশাখে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এখন অভিধান সমাপ্তপ্রায়। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ, আমার সুহৃদ্‌গণ ও ছাত্রবৃন্দেব অর্থ-সাহায্যে এবং গ্রাহকগণের আনুকূল্যে এই দীর্ঘ দশ বৎসর কোন প্রকারে মুদ্রাঙ্কণের কায নির্ব্বিঘ্নে চলে আসছে। এখন আশা কবা যায়, আমার জীবিতকালেই শব্দকোষ সম্পূর্ণ হবে, গুরুদেবের এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণীও তা হ'লে সার্থক হবে।

অভীষ্ট বিষয়ের সমাপ্তিতে, বিশেষতঃ এরূপ দীর্ঘকালসাধ্য অভিপ্রেত ব্রতবিশেষের উদ্‌যাপনে, স্বীয় শ্রমসাফল্যে ব্রতীর নিরতিশয় আনন্দ

স্বাভাবিক; কিন্তু বিশেষ বিষাদের বিষয় যে, আমার এই ব্রতসাধনের বিপৎসঙ্কুল কঠোর পথে, আমার ক্ষণিক পরম সৌভাগ্যোদয়ে যে সকল সহৃদয় দরদী মহাজনের সঙ্গতিলাভ ক'রেছিলাম, তাঁরা এখন কোথায়! শব্দকোষের প্রবর্ত্তক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কালকবলিত! দীর্ঘকাল বৃত্তিদাতা দানবীর মহাত্মা মণীন্দ্রচন্দ্র অস্তমিত! শব্দকোষের দরদী হিতৈষী সাংবাদিক-শিরোমণি রামানন্দ পরলোক-প্রবাসে প্রবাসী! তাই, আমার সেই নিরতিশয় আনন্দ ভাগ্যচক্রের ক্রূর আবর্ত্তনে নিরতিশয় বিষাদের কালিমায় মলিন! ইহা পরম করুণ দৈবদুর্বিপাক! নিষ্করুণ কালের নিদারুণ কুটিল গতি!

"তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি॥"

-- কবির এই শান্তির বাণীই এখন শান্তিলাভের উপায়।

বৎসগণ, এইখানে আমার অভিভাষণের পরিসমাপ্তি। ভগবানের নিকটে তোমাদের ভগবদ্ভক্তি ও সংসারযাত্রায় চিরশান্তিসুখ প্রার্থনা ক'রে কবির ভাষায় বলি :—

"শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে
নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে,
নির্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র,
অনিমেষ মম লোচনে,
গভীর তিমির মাঝে॥"

ভক্তির শেষ অঞ্জলি

লোকে প্রসিদ্ধি, পরশ-পাথর স্পর্শগুণে লৌহে স্বর্ণের গুণাধান করিয়া লৌহকে স্বর্ণময় করে। এই স্পর্শমণি লৌকিক, পারমার্থিকভাবে স্পর্শমণি—পরাবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সর্বত্র ভগবৎসত্তার বুদ্ধিতে তন্ময়চিত্তে বিশ্বরূপ ভগবানের বিভূতিযোগের জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানের মূল কোথায়?—কোন বীজ হইতে এই জ্ঞানের অঙ্কুর নির্গত বর্দ্ধিত পরিণত পুষ্পিত হইয়া মোক্ষফল প্রসব করিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মূলের অনুসন্ধান করিলে, পরম্পরায় দেখা যায়, এই অপার্থিব মোক্ষফলের মূল—সংসারে লোকশিক্ষার্থ-অবতীর্ণ অবতার বা মহাপুরুষ। সাধু সনাতন* যে অপার্থিব স্পর্শমণি লাভ করিয়া, যাহার স্পর্শে লৌহ স্বর্ণময় হয়, সেই পার্থিব স্পর্শমণিকে যমুনাপুলিনে বালুকার মত অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া বালুকাস্তূপ তাহার সমুচিত স্থান মনে করিয়াছিলেন, সেই পারমার্থিক স্পর্শমণি তিনি কিরূপে কাহার নিকটে পাইয়াছিলেন?—পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রেমিক প্রেমে আত্মহারা সন্ন্যাসি-শিরোমণি চৈতন্যদেবের সাহচর্যে, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে তত্ত্বোপদেশের ফলে হৃদয়ে সঞ্চরিত মহাপ্রেমের সাধনাব সিদ্ধিতে, যে প্রেমে তাঁহার অতুল সম্মানসম্পদ্ লোষ্ট্রবৎ অতিতুচ্ছ বোধ হইয়াছিল—যে প্রেম তাঁহাকে সর্বত্যাগী করিয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিল, ইহা সেই মহাবৈরাগ্যের মূল—মহাপ্রেম। বৃন্দাবনে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সনাতনের নিকটে যে স্পর্শমণি পাইয়াছিলেন, তাহা পার্থিব, পক্ষান্তরে মহাপ্রেমের সাধনায় সিদ্ধিতে গোস্বামীর যে স্পর্শমণি লাভ হইয়াছিল, তাহা অপার্থিব পারমার্থিক। তাই অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ সেই লৌহ-সোনা-করা স্পর্শমণি অতিতুচ্ছবোধে যমুনার গর্ভগত করিয়া সাধুর জ্ঞানগর্ভগত স্পর্শমণির নিমিত্ত সনাতনের চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। তাই বলি, সংসারে এই স্পর্শমণিলাভের মূল—সাধুসঙ্গ, সজ্জনসঙ্গতি—সাধুর দর্শনস্পর্শনজন্য শুদ্ধচিত্তের তন্ময়ভাব।

---

* দ্রষ্টব্য ভক্তমালাগ্রন্থ, দ্বিতীয় মালা। রবীন্দ্রনাথ প্রণীত 'কথা'— স্পর্শমণি।

সংসারচক্রের আবর্ত্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে সৌভাগ্যক্রমে আমারও সজ্জনসঙ্গতি ঘটিয়াছিল; ফলে, সে স্পর্শমণিলাভ আমার ভাগ্যে না থাকিলেও, আমার লৌহময় চিত্ত স্বর্ণময় না হইলেও, সাধুসঙ্গমে যে তাহার মলিনত্বের কিছু অবসান হইয়াছে, ইহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই মহাপুরুষ দেশপূজ্য প্রতিভাবান্ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। শুভদিনে শুভক্ষণে তাঁহার সহিত শুভ সমাগম হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল তাঁহার অনন্যসুলভ আশ্রয় সান্নিধ্য সাহচর্য্য উপভোগ করিয়াছি। এখন বুঝিতেছি, আশ্রমে আশ্রয়লাভের পূর্বে সাংসারিক জীবনের যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহার পরিণাম ও আশ্রম-জীবনের বর্ত্তমান পরিণতি—এই দুইএর মধ্যে ভূয়ান্ প্রভেদ, আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সে পথে মনুষ্যজীবনের সমুচিত সার্থকতা ছিল কি না, জানি না; কিন্তু এ পথে সে সার্থকতা নিশ্চয়ই ছিল; তবে সে সার্থকতা আমার জীবনে সম্পূর্ণ চরিতার্থ না হইলেও, সৎসঙ্গতি যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। কবি যে পথে তুলিয়া দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, পথিক আমি সোপানপরম্পরায় সে পথে অগ্রসর হইয়া সেই পরশরতন লাভ করিতে পারি বা না পারি, তাহা আমারই সাধনাশক্তির ন্যূনাধিক্যেরই পরিচায়ক। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কে এ দশান্তর ঘটাইল—তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি; সে বিষয়ে আর বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

কবি স্বর্গগত, আমারও এই জীবনের চরম দশা; তাই শেষ কথা—যাঁহার প্রসাদে এ জীবনের চরম ও পরম সম্বল যাহা-কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই স্মরণ করিয়া তাঁহার দিব্য আত্মার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তির এই শেষ অঞ্জলি নিবেদন করি; আশা করি, ইহা উদ্দেশ্যবিচ্যুত হইবে না।

পরিশিষ্ট

দার্শনিক কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রয়, সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে মহাত্মার মহাগুণের সহিত বিশেষ পরিচয় হয়; এই পরিচয় মহাত্মাকে পরিচিতের নিকটে মানবরূপী দেবতা করিয়া তুলে, দেবতার ন্যায় মনোমন্দিরে পূজিত করিয়া রাখে। দ্বিজেন্দ্রনাথের আশ্রয়, সান্নিধ্য বা সাহচর্য্য আমার ভাগ্যে তাদৃশ পরিচয়ের কারণ হয় নাই সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে যখন ক্ষণিক সান্নিধ্য বা সাহচর্য ঘটিয়াছিল, তখনই তাঁহার কথায়, আচরণে, উপদেশে তাঁহার অনন্যসাধারণ যে সকল গুণের সহিত আমার কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার সেই সকল গুণগরিমার কথা, সমালোচকগণের সমালোচনা এবং আমার অতিবিশ্বস্তের নিকট হইতে সংগৃহীত তাঁহার চরিতকথা এই প্রবন্ধের বিষয়।

বহু বৎসর পূর্বে আমার ছাত্রাবস্থায় জোড়াসাঁকোর বাটীতে মাঘোৎসবে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রনাথকে আচার্যের কার্য করিতে দেখিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম দেখা। মনে হয়, তখন তাঁহাব যৌবনের শেষ, প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভ। ইহার পরে যে সময়ে শান্তিনিকেতনের মন্দিরের উৎসর্গ-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তখন আশ্রমে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দেখি। শান্তিনিকেতনে আসার মাঠের পথে তাঁহার বৈবাহিক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিষয়বিশেষের কথোপকথন করিতে করিতে তিনি আমার আগে আগে আসিয়াছিলেন, আমাব বেশ মনে আছে। পরে ১৩০৯ সালে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তগন তাঁহাকে দেখি নাই, কিছুকাল পরে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; মনে হয়, সে ১৩১০ সাল। নীচু বাঙলায় যে আশ্রম-কুটীর আছে, তাহাই তাঁহার নির্দিষ্ট বাসভবন ছিল, তিনি যাবজ্জীবন এই আশ্রমের ঋষি ছিলেন।

দার্শনিক বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রনাথের সমধিক প্রসিদ্ধি। মাসিকপত্র বঙ্গদর্শনে (নবপর্যায়) তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধ "সার সত্যের আলোচনা" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। (১) তাঁহার লিখিত "গীতাপাঠ"ও দার্শনিক প্রবন্ধমালা।

১২৯২ সালে "ভারতী"তে দার্শনিক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটির নাম "Positivism কাহাকে বলে?" দ্বিজেন্দ্রনাথ "পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম" নামে তিনটি প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুতার্কিক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে নিজেই লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকমল is not যে-সে লোক —He is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine." (২)

দর্শনশাস্ত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ খ্যাতি ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার যে কাব্য রচনার শক্তি ছিল, তাহা কোন কারণে তাদৃশী খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও কাব্যরসিক নিপুণ সমালোচকের সমালোচনায় সেই কবিশক্তির বিশেষ প্রশংসা আছে এবং ইহাই তাঁহাকে কবিসমাজে উচ্চ স্থান পাইবার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছে, মনে হয়। তাঁহার "স্বপ্নপ্রয়াণ" দার্শনিক রূপককাব্য; ইহার দার্শনিক ভাবের ত কথাই নাই, নিপুণ সমালোচক কাব্যরসিকগণ কাব্যাংশেও বিচারপূর্ব্বক ইহাকে কাব্যমধ্যে বিশিষ্ট স্থানই দিয়াছেন।

মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁহার সমসাময়িক

---

(১) 'বঙ্গ দর্শন' (নবপর্যায়), ১৩০৮ হইতে ১৩১১ সাল পযন্ত চার বৎসর।

(২) 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' - ২ "কৃষ্ণকমল-ভট্টাচার্য্য"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৩ পৃষ্ঠা।

কোন উদীয়মান কবিকে কবির গৌরবের আসন দেন নাই, কিন্তু তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতায় কবিশক্তির প্রশংসা করিয়া কোন প্রিয়তম সুহৃদ্‌কে বলিয়াছিলেন,—

"If I am to doff my cap to any modern Bengali poet, it must be to the author of the "Swapna Prayan" and to no body else." (৩)

মধুসূদনের এই স্বল্প মন্তব্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাৎকালিক বঙ্গীয় কবিকুলের শিরোমণি করিয়া রাখিয়াছিল।

সুনিপুণ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় বিখ্যাত মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শনে" "স্বপ্নপ্রয়াণে"র প্রথম সর্গ সম্পূর্ণ কবির নামোল্লেখ না করিয়া, প্রকাশিত করিয়াছিলেন। (৪) বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের সমালোচনা করেন নাই সত্য, কিন্তু ইহার কাব্যত্ব তাঁহার হৃদয়-গ্রাহী না হইলে, তাঁহার বিশিষ্ট পত্রিকায় কখনই ইহার স্থান হইত না।

স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় তাঁহার "রচনাবলী"তে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র সমালোচনায় লিখিয়াছেন,—"বাঙলা সাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখানি কবিতার দ্বীপ নিজের সূর্য্যাস্ত বর্ণবিলাসে, অন্ধকারে, শৈল-প্রাকারে, নিজের অধ্যাত্ম আনন্দের স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে—এখনো সেখান হইতে আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পড়িয়া যায় নাই। বাস্তবিক সেকালের অন্যান্য কবিতার পার্শ্বে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যখানিকে ধরিয়া দেখিলে অনেক কথা মনে হয়।" ইত্যাদি।

"চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনোহারিত্বই 'স্বপ্নপ্রয়াণে' প্রথমেই চোখে পড়ে। যেখানে বা চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একটি

---

(৩) "রবীন্দ্র-কণা-" খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৫৮ পৃষ্ঠা।

(৪) 'বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৮০, ২০৪-২০৬ পৃষ্ঠা।

অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গীতে পাঠকের মন উন্মত্ত হইয়া থাকে।” ইত্যাদি। (৫)

সাহিত্যিক পণ্ডিত সমালোচক স্বর্গগত প্রিয়নাথসেনের “প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি”তে প্রকাশিত স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম সর্গের বস্তুনির্দেশ-পূর্বক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় এই কাব্য উত্তম কাব্যাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। (৬) বিশেষ দুঃখের বিষয়, সমালোচক পরবর্তী সর্গসমূহের বিষয়-বিবৃতি-সহিত তাঁহার অভিমত কাব্যগুণের সম্পূর্ণ সমালোচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

“প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলী”তে এই কাব্যের ছন্দের সমালোচনায় সমালোচক লিখিয়াছেন,—ইহার ছন্দ কবির (নিজের) মৌলিক সৃষ্টি! ‘স্বপ্ন-প্রয়াণে’র ছন্দ পূর্বেকার কোন কবি গড়েন নাই এবং পরবর্তী কোন কবিই এই ছন্দে লিখিতে বা ইহার অনুকরণ করিতে সাহস করেন নাই। এমন কি রবীন্দ্রনাথও করেন নাই।” (৬)

‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ ভিন্ন পৌত্র দিনেন্দ্রনাথের সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতাসমূহের সঞ্চয়গ্রন্থ “কাব্যমালা”র কবিতা—‘কৌতুক না যৌতুক’, ‘গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য,’ ‘মেঘদূত,’ ‘সেরামালি’ ইত্যাদিও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট ও কাব্য-মধ্যে গণনীয় হওয়ার অধিকারী মনে হয়। (৭)

“গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য” রাজনারায়ণ বসুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহার সমাপ্তি-শ্লোকে কবি ফলশ্রুতিতে লিখিয়াছেন,—

---

(৫) সতীশ চন্দ্র রায়ের “রচনাবলী” ২১০, ২১১ পৃষ্ঠা।

(৬) “প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি,” ২৬৪, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

(৭) “কাব্যমালা”—প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭ সাল।

"পড়ে যেই লোক এই শ্লোক,
পায় সে গুম্ফলোক, ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী ভারী ভারী,
গোঁফের সেবা করি, সুখে বিচরে।।"

"মেঘদূত" কালিদাসের খণ্ডকাব্য "মেঘদূতেব" বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ। বাল্যে পাঠ্যপুস্তকে এই অনুবাদের কিয়দংশ ত্রিপদী ছন্দে রচিত "প্রবাসী যক্ষেব গৃহস্থলীবর্ণন-কবিতা পড়িয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথেব নিপুণ লেখনীপ্রসূত। অনুবাদে মূলের কাব্যসৌন্দর্য্য সম্যক্ রক্ষিত না হইলেও, ইহাতে অঙ্কিত চিত্র বেশ চিত্তরঞ্জক, ভাষা সরল সহজ ললিত গতিভঙ্গীতে মনোহারিণী, পডিতে পডিতেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়, আবৃত্তিও সুখোচ্চারণ হেতু শ্রুতিসুখকর। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—'মেঘদূতের যতগুলি অনুবাদ দেখেছি, তাদেব মধ্যে বডদাদার অনুবাদই উৎকৃষ্ট।' পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের অনূদিত "মেঘদূতে"র কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল ; আশা কবি, ইহাতে কবির মন্তব্যের সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

মেঘদূত—পূর্বমেঘ

"কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
কান্তাসনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম-কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
'বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ।'
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তাহে খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।

রবিতাপ ঢাকা পড়ে বিপিন-বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।

উত্তরমেঘ

কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
পরকাশে মণিময় ঘাট॥
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস-হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস-সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে॥

* * *

তাহার (আশোকের-বকুলেব) মাঝেতে আর,
ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়॥
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা॥

"সেরামালি"র সেরা আবৃত্তি কবির মুখেই শুনিয়াছি। আবৃত্তিকালে হাস্যরসের বর্ণণায় কবির অট্টহাস্যের স্মৃতি এখনও জাগরূক রহিয়াছে। "সেরামালির" কতিপয় হাস্যরসাত্মক শ্লোক পাঠককে হাসাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত করিলাম।—

আপদঃ শান্তিঃ

"দৌড়িয়া আসিছে কবি ছাতাটি বগলে।
সহাস্য-বদনে সখা দুয়ার আগলে॥
বলে কবি "বন্ধুর এমনি বটে কাজ।"
হাসে আব কাষ্ঠ-হাসি কষ্টে ঢাকি লাজ॥
চৌকাঠ ডিঙা'বে যেই খাইল হোঁচোট্।
"আবে। আরে!" বলে সখা "লাগে নি তো চোট্?"
পিছলিয়া পড়িতে পড়িতে কবি বাঁচে।
হাসিতে নারিয়া সখা "হেচ্চো!" কবি হাঁচে॥
বলে আর "কবিত্বের বাম-নাম কীট
জলে ভিজি এইবারে হইয়াছে ঢীট।
মূর্তি যে হয়েছে তব—কেমনে বাখানি!
বাসি হইলেই ফলে কাঙালের বাণী॥"

* * *

"অই আসিতেছে মালী।" "পুঁটুলিতে কি ও।
তপ্ত মুড়ি এনেছ যে। শতবর্ষ জিও।"
উপস্থিত করে মালী চারি ধামা মুড়ি।
লঙ্কা আর পাড়ি আনে গামছা দিয়া মুড়ি॥
ঝাঁঝাল সর্ষপ তৈলে পুরি আনে ভাণ্ড।
কবি বলে "সর্ব্বনাশ! কবিছ কি কাণ্ড!

হাতির খোরাক এ যে! হরে হরে হরে!
এ দু ধামা রাখ তুলি আপনার তরে ॥"
এত বলি মুঠা মুঠা মুড়ি করে পার।
চারি ধামা হয়ে গেল নিমিষে উজাড় ॥"

দিনেন্দ্রনাথের সম্পাদিত "প্রবন্ধমালায়" তাঁহার পিতামহের গদ্যপ্রবন্ধ-সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। (৮) এই প্রবন্ধ-সমূহের পাঠে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বিশেষ শক্তির এবং লিখিত বিষয়ের বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত-করণে বিচারশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বাঙ্‌লায় "রেখাক্ষর-বর্ণমালা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইহার পাণ্ডুলিপি নিখুঁত করিবার জন্য তিনি ধৈর্যের সহিত অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন,—অনেকবার কাটিয়া-ছাটিয়া নূতন করিয়া লিখিয়াছেন। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার তিন সংখ্যায় ইহার কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। (৯) রেখাক্ষরে লেখায় অল্পাক্ষরের সুবিধার জন্য বাঙ্‌লা-বর্ণমালার কোন কোন বর্ণ ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। রেখাক্ষরের বর্ণনা ও অনুশীলনী সবই কবিতায় রচিত হইয়াছিল; কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই ইহার কিছু কিছু পড়িয়া অধ্যাপকগণকে শুনাইয়াছিলেন। নিম্নে দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

---

(৮) "প্রবন্ধমালা"—প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৮ সাল।

(৯) "শান্তিনিকেতন," ১৩২০ সাল, কার্তিক,। পৌষ (৪র্থ বর্ষ, ১০ম, ১১শ সংখ্যা) ১৫৭; ১৯৩ পৃষ্ঠা; চৈত্র (৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা), ৪১ পৃষ্ঠা।

বত্রিশ সিংহাসন

"ব্যঞ্জনবরণ নহে চৌত্রিশের কম।
কারে রাখি, কারে ঠেলি, সমস্যা বিষম॥
"এক ব-এ বস্ আছে।" হাকে রেখাচার্য্য।
"চালাবে দন্ত্য-ন অ্যাকা দুই ন-এর কার্য্য॥"
অন্ত্য ব ণত্ব-ণ করি গোপনে মন্ত্রণা,
ত্যজিল বরণমালা—ঘুচিল যন্ত্রণা।
এ দুটা আছিল মোর দু-চক্ষের বিষ।
চৌত্রিশের দুই গেল রহিল বত্রিশ॥
বর্ণে বর্ণে বসি গেল বর্ণ আট আট
চারি আটে হয়ে গেল বত্রিশ ভবাট॥"

ঝন্ঝনায়মান যুক্তাক্ষরের পদাবলী

"আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি॥
কালিন্দীর কূলে বসি কাঁদে গোপনারী—
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আছে কাণ্ডারী॥
আর কি সে মনচোর দেখা দিবে চক্ষে।
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে॥"

ফর্ফরায়মান পদাবলী

"বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর কব?
নিত্য হয় অভিনয় দৃশ্য নব নব॥

এলেন বিলাতফের্তা গায়ে কোর্তা-কুর্তি।
অর্ধ-গোরা, অর্ধকালা, বর্ণচোরা মূর্তি ॥” ইত্যাদি।

নাচুনে ঢঙ্গের গোটাচাইর ছত্র

“শিল্লিবধূ ফুল্‌কুমারী আল্‌তা পরি পায়,
কল্কাপেড়ে শাড়ী বাগিয়ে পরে গায় ॥
যেই শুনিল পাল্কি এল, অম্নি তাড়াতাড়ি।
ভেল্কিবাজি দেখতে গেল বেলফুলের বাড়ী ॥”

**দীর্ঘনিঃশ্বাসভরা পদাবলীর হা-হুতাশে
পালা সমাপ্ত**

“কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি ব্রজের গেছে সুখ।
শুষ্কমুখ রাধিকার দুখে ফাটে বুক ॥
ভ্রষ্ট হ’য়্যে বক্ষে ঝাঁপে কৃষ্ণবেণী ফণী।
দংষ্ট্রাহত কমলিনী লুটায় অবনী ॥
অষ্ট সখী কষ্টে বলে, শোআইয়া কোলে।
নষ্ট করিও না তনু কৃষ্ণ এল বোলে ॥” ইত্যাদি।

উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের রসজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, ভাষা সরল সরস, ছন্দের বিষয়ানুরূপ ভঙ্গীতে ও বর্ণনীয় বিষয়ের নির্বাচনে কবিতাব নামকরণগুলি সার্থক হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—“রেখাক্ষর সেও এক অপূর্ব্ব বস্তু, তাতে কত কবিত্বরস, কতরকম রেখাপাতের কৌশলের ছড়াছড়ি, না দেখ্‌লে তার মর্য্যাদা বোঝা যায় না।”

কথ্যভাষায় লেখার শক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছিল। কবি বলিয়াছিলেন,—“বড়দাদা যেমন কথ্যভাষায় সহজ সরস ক’রে প্রবন্ধ

লিখ্‌তে পারেন, আমরা সেরূপ পারি না; এটা তাঁর স্বাভাবিক শক্তি।"
এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ;—"পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার একটি মাধুর্য্য প্রসাদগুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে, তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

সংস্কৃত কাব্যে আশ্রমবর্ণনায় আশ্রমস্থ পশুপক্ষী বৃক্ষলতা—ইহাদের প্রতি আশ্রমবাসীর সদয় আচরণ ও মমতার নিদর্শন এবং ইহাদের পরিপালন ও পরিবর্ধনের বিবরণ পাওয়া যায়। ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের আশ্রমে পশু পক্ষী ও কীটের প্রতি মমত্ব প্রদর্শন, সদয় ব্যবহার এবং খাদ্য-দানে তাহাদের পরিপালন ও পরিপোষণ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আশ্রমে এরূপ ভূতবলিযজ্ঞ নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত। প্রাতরাশের সময় হইলে, বলিভোজনে অভ্যস্ত কাক, শালিক, কাঠবিড়ালী, কুকুর নিয়মিত অতিথিরূপে আতিথ্য-গ্রহণার্থ তাঁহার নিকটে আসিয়া হাজির হইত। তাঁহাব টেবিলের উপরে রেকাবিতে মাখা ছাতু থাকিত, তিনি ছাতুর বড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া দিতেন, পরিবেশন শেষ হইতে না হইতেই তির্যগ্‌-জাতি অতিথিরা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত। ধূর্তপনায় কাকের বাহাদুরী প্রসিদ্ধ, সে খাদ্যের বাড়াভাগই লইত, দ্বিজেন্দ্রনাথ এই হেতু বড়িগুলি কখন কখন তাঁহার আসনের নিকটে ফেলিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে কাঠবিড়ালী তাঁহার হাত হইতে নিরাতঙ্কে ছাতু লইয়া খাইত, তিনি স্তম্ভবৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

একটি অজ্ঞাতপক্ষ শালিকশাবককে দ্বিজেন্দ্রনাথ পালন করিয়া-ছিলেন। সে নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসিত, গায় মাথায় উড়িয়া বসিত ; তাহার এইরূপ যথেচ্ছ অত্যাচারে তিনি বিরক্ত হইতেন না। একদিন এই দুলাল শালিক মাথায় বসিয়া জাতিস্বভাবে তাঁহার চোখে ঠোকর

দিয়াছিল ; ঠোকরটা একটু কঠোর হইয়াছিল, চোখটি অনেকদিন লাল ছিল, তজ্জন্য তিনি কিছু যন্ত্রণাও ভোগ করিতেছিলেন, ইহাতে কিন্তু সেই দুলালের দুলালত্বের কিছু ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার রচিত "বিজন কুটীরে মায়ার ফাঁদ" (১০) কবিতায় এ বিষয়ে সরল ভাষায় সরস বর্ণনা আছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তির্যগ্-জাতির প্রতি তাঁহার মনোবৃত্তির ইহা প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

"সাধের মশা, সাধের মাছি,
সাধের পিঁপড়ে, পোকা মাঁকড়।
বোস্ রে গায়ে, বোস্ রে পায়ে,
কোর্‌ব না আমি ধর-পাকড়॥
আয় আয় কাক, ছাড়ি কা-কা ডাক,
তোরে বড় বেশী ডাকতে হয় না।
তুই রে শালিক, বড় বে-রসিক,
খাবার দেখ্‌লে সবুর সয় না॥
কাঠবেড়ালী কোথা পালালি,
আয় আয় আয় দৌড়ে আয়।
বড় তুই বোকা! ছাতু খাবি তো খা!
কথা বুঝিস্‌নে—এ বড় দায়॥
সাবাস্ শুব, তুই কুকুর!
ভয়ে এগোয় না চোর ডাকাত।"

* * *

শত্রু মিত্র চপল ধীর।
বাছারা সবাই হ'ল হাজির॥

---

(১০) "শান্তিনিকেতন," ১৩৩১ সাল, অগ্রহায়ণ (৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা), ২০৯ পৃষ্ঠা।

কাঠবেড়ালী পালে পালে।
ভোজে বসি গেল ছাতুর থালে॥

সত্যেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বনের জন্তু পাখী বশ করবার বড়দাদার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন, আর কত চড়াই শালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউলখাকী আয় না—ঠোকরাণী'।—এই আদুরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন, কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের তো কথাই নেই, ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই।"

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালও বিদ্যালোচনায়ই অতিবাহিত হইয়াছে। অধিক রাত্রি-পর্যন্তও তাঁহার প্রবন্ধাদি লেখা-পড়া চলিত—ক্লান্তি হেতু অধীর হইতেন না। প্রবন্ধাদির নিমিত্ত কোন পরিচিত সম্পাদকের তাগিদ আসিলে তিনি লেখায় তন্ময় হইয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। একবার প্রবাস'র সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে তাগিদ দিয়াছিলেন; দ্বিজেন্দ্রনাথ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; রাত্রি কত হইল, তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। শেষ রাত্রি চারিটার সময়ে ভৃত্য মুনীশ্বর উঠিয়া দেখিল, তিনি একাগ্রচিত্তে লিখিতেছেন। বিস্মিত হইয়া প্রভুর নিকটে গিয়া ভৃত্য জানাইল,—"রাত্তির শেষ হয়েছে, বাবা-মশায় আপনি ঘুমান নি, এখনও লিখ্‌ছেন!" প্রভু ভৃত্যের কথায় বিশ্বাস করিলেন না, একটু বিরক্তই হইলেন, সিদ্ধান্ত করিলেন, ও ঠিক জানে না, অনুমান করেই বলেছে। সুতরাং লেখা পূর্ববৎ নিরুদ্বেগেই চলিল। কিছু পরে প্রত্যুষে যখন কাক-কোকিল রাত্রির অবসান জানাইয়া দিল, তখন নিজ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত জানিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তাই ত মুনীশ্বর, তুমি ঠিকই ত বলেছ! রাত পোহাল!"

কবিতা ও প্রবন্ধের শব্দবিন্যাস বা বাক্যরচনা মনঃপূত না হইলে, তিনি কাটিতে-ছাটিতে একটুও আলস্য বোধ করিতেন না। মুদ্রাযন্ত্রগত লেখারও পরিবর্ত্তন পরিবর্ধন তাঁহার মাথায় ঘুরিত। প্রত্যেকবার প্রুফ কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন করিতেনই। কবিরও নিজ প্রবন্ধের এইরূপ কাটছাটের কথা প্রবাসীর কোন কর্ম্মচারীকে লিখিত পত্রে দেখিয়াছি।

"বহুবিবাহ" নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। নিপুণ অধ্যাপকের শিক্ষাগুণে মেধাবী শিষ্য শীঘ্রই সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করিয়া যে অনুষ্টুপ্ ছন্দে শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুইটি উদ্ধৃত করিলাম;—

"ইংরাজরাজ-রাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতম্।
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্তি তৎ॥
পয়ঃ-পূরিপ্রবাহিণ্যা গঙ্গয়া পুণ্যসংজ্ঞয়া।
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেঘলিনীব সা॥"

সংস্কৃত ছন্দে কতকগুলি বাংলা কবিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে মন্দাক্রান্তা ও শিখরিণী ছন্দে রচিত দুইটি কবিতা পাঠককে উপহার দিলাম:—

টঙ্কাদেবী

"ইচ্ছা সম্যগ্ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিকলী মন উড়ু-উড়ো এ কি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা।"—মন্দাক্রান্তা।

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত-যাত্রা

"বিলাতে পালাতে ছট ফট করে নব্য গউড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগবিহগ-প্রাণ দউড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন-বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাটটা কোটটা ধুতি পিরহনে মান রয় না॥"—শিখরিণী।

স্বপ্নপ্রয়াণে কবি নিজ পরিচয়চ্ছলে সহোদবগণের নামোল্লেখ ও বাসস্থান নির্দেশ করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠকের কৌতুকজনক হইবে। ইহা কেবল কতকগুলি নামমাত্রের কবিতা নহে, নিজের সার্থকতার পরিচায়ক ক্রিয়া ও সুকোমল পদের প্রয়োগে কবিতাটি সরস ও সুখপাঠ্যই হইয়াছে, মনে হয়। কবিতার বর্ণনা এইরূপ ;—

"ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি॥

কাগজের বাক্‌স প্রকরণ

লেখার সাজ-সরঞ্জাম রাখার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের কাগজের বাক্‌স প্রস্তুত করার প্রকরণ বিশেষ কৌতুকজনক। কাগজ, দোয়াত, কলম, চশমা রাখার ছোট বড় নানারকম বাক্‌স তিনি কাগজের নানাপ্রকার তোড়জোড় ও ভাঁজের বাঁধন দিয়া পরিপাটিপূর্বক রচনা করিতেন। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"জিজ্ঞাসা করলে, বড়দাদা হেসে বলেন, এ বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-সহকারে তাহা আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন। বাক্‌স-তত্ত্বের জন্য

সমস্ত গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয়সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নতুন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে।”

দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি সরল উদারচেতা পুরুষ ছিলেন; সংসারে থাকিয়াও তিনি সংসারের লোক ছিলেন না। সংসারের কিছুই বুঝিতেন না; বস্তুতঃ তিনি সংসারাশ্রমে মুনিরই ন্যায় নিঃসঙ্গভাবে জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমে ভিক্ষুক সাধু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে আসিত, অর্থাদি প্রার্থনা করিত। পাত্রবিশেষে দানের ন্যায্য পরিমাণ তিনি একেবারেই বুঝিতেন না, ফলে দানের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া পড়িত। সাধু-সন্ন্যাসীর বুজরুগী তাঁহার বিশেষ বিরক্তিকর ছিল; ইহাদিগকে তিনি আশ্রম হইতে সরাইয়া দিতেন। অন্নার্থী ও বস্ত্রপ্রার্থীর প্রার্থনা তিনি সহানুভূতির সহিত পূর্ণ করিতেন।

পিতৃদেবের এইরূপ চিত্তবৃত্তি জানিয়া দ্বিপেন্দ্রনাথ এই দানের ব্যবস্থা নিজের হাতে লইয়াছিলেন। অতঃপর প্রার্থী আসিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাকে পুত্রের নিকটে পাঠাইতেন, দ্বিপেন্দ্রনাথ অবস্থা বুঝিয়া দানের ব্যবস্থা করিতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের উচ্চহাস্য তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক। এরূপ প্রাণখোলা মুক্তকণ্ঠে হাস্য আমি আর কাহারও শুনি নাই। কথাপ্রসঙ্গে বা কবিতাপাঠে হাস্য-রসের কথায় তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, দূর হইতেও স্পষ্টই শোনা যাইত। সত্যেন্দ্রনাথও এই অট্টহাস্যের কথা লিখিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভোলা স্বভাব সময়ে সময়ে বিপত্তির কারণ হইয়া উঠিত। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—“বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ কত তম্বী…হচ্ছে, আমরা দেখেছি অনেক সময় অকারণ; চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার-ধ্বনিতে

আকাশ ফেটে যাচ্ছে, অথচ সেই চশমা তাঁর চোখের উপর কপালে ঠেকান রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত, কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই, তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে, কখন তার জন্যে খাবার আসে, শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেল, হাঁকাহাকি ডাকাডাকি পড়ে গেল। একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, বন্ধু বসেই আছে, অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা কারণ জান্‌তে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পিঠ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন।”

জ্যেষ্ঠ পুত্রই দ্বিজেন্দ্রনাথের আহারাদির বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। প্রতিদিনই তিনি যথাসময়ে পিতার প্রাতর্ভোজনাদির ব্যবস্থা করিতেন, কোন ত্রুটি হইত না। তিনি পিতার জন্য নানাবিধ ফলমূল মিষ্টান্ন আনাইয়া রাখিতেন। এই পিতৃভক্ত পুত্রের জীবিতকালে দ্বিজেন্দ্রনাথেব কোন বিষয়ে কোন অভাব-অভিযোগ শুনি নাই। দ্বিপেন্দ্র-নাথের অকালমৃত্যুতে তাই বৃদ্ধ পিতা শোককাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “—আমার ছেলে B. A , M.A. পাশ করে নি, কিন্তু সে আমার কি ছিল তা আমিই জানি!” উপযুক্ত পুত্রের শোকে কাতরহৃদয় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার কলুষিতকণ্ঠের এই অর্ধস্ফুট বাক্য চিরকাল মনে থাকিবে।

আমার অভিধান-সঙ্কলনের বিষয় দ্বিজেন্দ্রনাথ জানিতেন। আমি এক সময়ে তাঁহার আশ্রমের নিকটেই থাকিতাম। সে সময়ে শব্দেব বিষয়ে কোন সংশয় হইলে, তিনি লিখিয়া জানাইতেন, আমিও যাহা জানিতাম,

তাঁহাকে লিখিতাম। একদিন্ তিনি কোন একটি শব্দের অর্থ জানাইবার জন্য আমাকে লিখিয়াছিলেন। আমি যাহা জানিতাম তাহাই লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সে অর্থ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তিনি তখনই তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া ভৃত্যকে পাঠাইয়াছিলেন। ভৃত্যের নিকট হইতে কাগজটুকু লইয়া পড়িয়া দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন,—"তোমার এই অর্থ ঘট—কচু—ড়ামণির মতই হইল।" আমি উত্তরে জানাইলাম, ইহা আমার মনগড়া অর্থ নহে, যাহা অভিধানে আছে তাহাই জানাইয়াছি। আমার এইরূপ উত্তরে তাঁহার অশিষ্টাচার হইয়াছে ভাবিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তখনই ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠাইলেন। ভৃত্য বলিল,—"বাবা মশায় ডাকছেন, চলুন।" আমি বলিলাম, "আমার কথায় তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এখনই গেলে হয়ত কিছু অপ্রিয় ব'লতে পারেন, তাহলে বড় দুঃখের বিষয় হবে; তিনি একটু শান্ত হন, একটু পরেই যাচ্ছি, বল গে।"

কিছুক্ষণ পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পথে স্থির করিলাম,—বোবার শত্রু নাই, যাহাই বলুন কিছুই বলিব না। নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সহজ কথায়ই বলিলেন,—"বুঝেছি, অসন্তুষ্ট হয়েছ, জানত বুড়ো মানুষ ছেলে মানুষ, দুইই সমান, মনে কিছু করো না।" আমি বিনীতভাবে বলিলাম,—"আমি অসন্তুষ্ট হইনি, আপনি বিরক্ত হয়েছেন, এই ভয়ই কচ্ছিলাম, এখন সে ধারণা গেল।" নিজ অশিষ্টাচারে আপনাকে দোষী মনে করা মহাত্মারই লক্ষণ। কবির মুখেও একবার এইরূপ নিজ দোষ-স্বীকারের কথা শুনিয়াছিলাম।

উৎসবোপলক্ষ্যে কবি বড়দাদাকে প্রণাম করিতে যাইতেন। প্রণাম করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের পায়ের নিকটেই রবীন্দ্রনাথ বসিতেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের ভ্রাতৃভক্তির এবং কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃবৎসলতার এই পবিত্র দৃশ্য—একের ভক্তি অন্যের বাৎসল্য, বস্তুতঃই

যেমন হৃদয়গ্রাহী ও সমাজের স্থিতিমূলক, তেমনি স্বজনের এইরূপ আচার-ব্যবহারও সমাজের বিশেষ হিতকর ও শিক্ষণীয়।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্য ছিল না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, এলোপ্যাথিক ঔষধে শরীরের যান্ত্রিক দোষ জন্মে। একবার তিনি শান্তিনিকেতনে পীড়িত হইলে, চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে কলিকতায় লইয়া যাওয়া স্থির হয়। দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে এই প্রস্তাব করিলে, তিনি একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। শেষে আত্মীয়গণেব অনুরোধ বার বাব অন্যথা করিতে না পারিয়া অগত্যা কলিকাতায় যাইতে স্বীকাব করিয়াছিলেন। কবি তখন আশ্রমে অনুপস্থিত।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বরোদাদা (বড়দাদা) বলিতেন। বড়দাদার প্রতি দীনবন্ধুর ভক্তি যেমন ঐকান্তিক দেখিয়াছি, দীনবন্ধুর প্রতি বড়দাদাবও স্নেহ সেইরূপ অগ্রজোচিত ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়া যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, পীড়িতের সেবকভাবে দীনবন্ধু তখন সর্বদাই তাঁহাব রোগশয্যাব পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন এবং রোগীর প্রয়োজনানুরূপ পথ্যেব ব্যবস্থা সেবা-শুশ্রূষাদি অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ নিজেই অক্লান্তভাবে সম্পন্ন করিযা রোগীকে সুস্থ ও প্রফুল্ল বাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তখন মুনীশ্বর নিকটেই ছিল, তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাকে ডাকিযা বলিযাছিলেন,—"মুনীশ্বর, সাহেবের পবিচর্য্যার পরিপাটি দেখ, শিখিযা রাখ।"

একবার কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথেব কাছে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তোমাব অভিধান কি ছাপান হচ্ছে?" তখন মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা কবিতে পারি নাই, বলিয়াছিলাম,—না, এখনও ছাপান আরম্ভ হয় নি। এইরূপ উত্তর শুনিয়া তিনি যেন নিরাশ হইয়াই বলিয়াছিলেন,—"তবে আর আমি তা

দেখ্‌তে পেলাম না।" ইহাই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ কথা। মুদ্রিত অভিধান তাঁহার হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ লইতে পারি নাই; তাঁহার সেই আশাভঙ্গের কথা আমার বিশেষ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে।

সাপ্তাহিক পত্রিকা "হিতবাদী"র নাম দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট। ১৮৩১ সনের ৩০এ মে (?) কৃষ্ণকমলের সম্পাদকত্বে "হিতবাদী" প্রথম প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমল তাঁহার 'স্মৃতিকথা'য় বলিয়াছেন—সাপ্তাহিক পত্রিকা "হিতবাদী" নামটি দ্বিজেন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময় ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে (১১)।

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিতাবলী তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ক্ষুদ্রতম একাংশমাত্র। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিত-গ্রন্থ লিখিত হইবে কি না, জানি না; যদি তাহা কখন রচিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনস্মৃতির একদেশ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হয়ত তাহার এক ক্ষুদ্রাংশের সহায় হইতে পারে।

---

(১১) 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২, "কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য",—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১ পৃষ্ঠা।